জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০

আবুল বারকাত ও জামালউদ্দিন আহমেদ
(যথাক্রমে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক)
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের খসড়া বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করার প্রাক্কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত

ঢাকা : সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হল
২৫ মে ২০১৯; সকাল ১১:০০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই "বিকল্প বাজেট ২০১৯-২০" একযোগে ঢাকাসহ, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, কুমিল্লা, খুলনা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, টাংগাইল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পাবনা, ফেনী, ফরিদপুর, বান্দরবন, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, লক্ষ্মীপুর ও সিলেটে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আয়োজনে প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০

আবুল বারকাত ও জামালউদ্দিন আহমেদ
(যথাক্রমে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক)
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের খসড়া বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করার প্রাক্কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত

ঢাকা : সিরডাপ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হল
২৫ মে ২০১৯; সকাল ১১:০০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত এই "বিকল্প বাজেট ২০১৯-২০" একযোগে ঢাকাসহ, কুষ্টিয়া, কক্সবাজার, কুমিল্লা, খুলনা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, টাংগাইল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পঞ্চগড়, পাবনা, ফেনী, ফরিদপুর, বান্দরবন, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, লক্ষীপুর ও সিলেটে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আয়োজনে প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০

স্বত্ব ২০১৯ © বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬; মোবাইল: ০১৭১৬-৪১৮৫০০
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bea-bd.org

মূল্য: ১০০ টাকা, ইউএস ১০ ডলার
(বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হবে)

প্রচ্ছদ
সৈয়দ এসরারুল হক

মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৯৭১-১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

উদ্ধৃতি সুপারিশ : আবুল বারকাত ও জামালউদ্দিন আহমেদ (২০১৯), জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা : ২৫ মে ২০১৯।

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৫

অনুচ্ছেদ ১. বঙ্গবন্ধু-দর্শনের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধে সিক্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ৬

অনুচ্ছেদ ২. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন দর্শন–রাজনৈতিক অর্থনীতি–বাজেট ৮

অনুচ্ছেদ ৩. অর্থনীতি ও সমাজে ভারসাম্যহীনতা: ধনী-দরিদ্র শ্রেণি বৈষম্য-অসমতা ১১

অনুচ্ছেদ ৪. মূল্যবোধহীন অর্থনীতি জন্ম দিচ্ছে অর্থহীন সমাজ: সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি ১৩

অনুচ্ছেদ ৫. বিশ্বায়ন ও নব্য-উদারবাদ: ভাবনা-দুর্ভাবনা ১৫

অনুচ্ছেদ ৬. দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন–কেন হচ্ছে, কতদূর হবে? ১৭

অনুচ্ছেদ ৭. আসন্ন (প্রচলিত) বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের সুপারিশমালা ১৮

অনুচ্ছেদ ৮. বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০১৯-২০ ৫৫

অনুচ্ছেদ ৯. আমাদের উপসংহার ৭৮

সারণি ১. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে আয়ের বাজেট **৬৫**

সারণি ২. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ব্যয়ের বাজেট **৬৯**

সারণি ৩. একনজরে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাব, ২০১৯-২০ (এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০১৮-১৯-এর তুলনা) **৭৭**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০

প্রস্তাবনা

২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সারা জীবন আপোষহীন লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। তাঁরই আহ্বানে সমগ্র জাতি ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশ স্বাধীন করেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক দর্শন ও উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নই হবে তার জন্মশতবর্ষে আমাদের দায়িত্ব। বঙ্গবন্ধুর দর্শন হল ক্ষুধামুক্ত, শোষণহীন, বৈষম্যহীন, আলোকিত মানুষ সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ; বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু 'মানুষ' এবং তিনিই শিখিয়ে গেছেন 'মুক্তি' পেতে হলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে "শোষিতের গণতন্ত্র"। "সোনার বাংলা" বিনির্মাণ নিয়ে ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন" (১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা)। বঙ্গবন্ধু-দর্শন-এর মৌল-ভিত্তি হল "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (একমাত্র জনগণই সার্বভৌম অন্য কেউ নন, অন্য কোন কিছুই নয়) এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হতে হবে চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা (যা আমাদের সংবিধানের ৮-১২ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত আছে)। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই ঐতিহাসিক এক্ষণে আগামী অর্থবছর ২০১৯-২০ এর বাজেট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম.পি-র নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত নতুন সরকারের প্রথম অর্থবছরের বাজেট। এ বাজেট হতে হবে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১-টি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন–উদ্দিষ্ট বাজেট (যার মধ্যে অন্যতম বিশেষ অঙ্গীকার হল: "আমার গ্রাম–আমার শহর", "তারুণ্যের শক্তি–বাংলাদেশের সমৃদ্ধি"); এ বাজেট হতে হবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ এবং তা থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরের পথনির্দেশক দলিল; এ বাজেট মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালের বাজেট। আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে মুক্তিযুদ্ধের দু'টি মূল চেতনা: (১) বৈষম্যহীন অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, (২) অসাম্প্রদায়িক মনন-সমৃদ্ধ আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ।

সুতরাং, সঙ্গত কারণেই আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে জনগণের প্রত্যাশা অনেক–এবং তা স্বাভাবিক। এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি–সে কারণেই এবারের বাজেট নিয়ে একদিকে যেমন বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জনপ্রত্যাশাকে গুরুত্ব দেয় তেমনি অন্যদিকে কোন ধরণের আত্মতুষ্টি ছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ উত্থাপনে আগ্রহী।

বঙ্গবন্ধু-দর্শন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি–এসব বিবেচনা থেকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির স্পষ্ট অবস্থান নিম্নরূপ:

১। আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের পক্ষে।

২। উচ্চ প্রবৃদ্ধি যেন গণমানুষের বহুমুখী বৈষম্য হ্রাসে কাজ করে–আমরা তা নিশ্চিত করার পক্ষে। আমরা অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের পক্ষে কিন্তু উচ্চহারে বৈষম্য বৃদ্ধির বিপক্ষে।

৩। জনবহুল বাংলাদেশে আমরা তারুণ্যের শক্তিকে প্রকৃত সম্পদে রূপান্তর করার পক্ষে; আমরা মানব সংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে চাই। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ সৃষ্টির পক্ষে।

৪। আমরা কর্মসংস্থান বিমুখ প্রবৃদ্ধির পক্ষে নই। আমরা ব্যাপক কর্মসংস্থান-মধ্যস্থতাকারী প্রবৃদ্ধির পক্ষে।

৫। আমরা বৈশ্বিক অর্থনীতির সম্ভাব্য সব ধরণের ন্যায্য সুযোগ নেবার পক্ষে (অর্থাৎ গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে আমাদের হিস্যা বাড়ানোর পক্ষে)।

৬। আমরা বঙ্গবন্ধুর চেতনার "দেশজ উন্নয়ন দর্শনের" পক্ষে।

অনুচ্ছেদ ১

বঙ্গবন্ধু-দর্শনের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধে সিক্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধে সিক্ত সংগঠন। এসব কারণেই আমাদের কাছে দেশ ও জনগণের স্বার্থ সবার উর্ধে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের মানুষের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে, এবং দেশের উন্নয়ন-প্রগতির সবকিছু ঐ চেতনার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করে। আমাদের সমিতির জন্য এ এক ঐতিহাসিক সত্য।

ঐতিহাসিক পরম্পরায় এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা:

- ✓ এখন থেকে ৫০-৫৫ বছর আগে (১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে) সেনাশাসিত-স্বৈরাচারী-সামন্তশাসিত পাকিস্তানের অন্যায্য-অন্যায় কাঠামোর মধ্যে দুই অর্থনীতির অন্ত:স্থিত বৈষম্য এবং তার কারণ-পরিণাম বিশ্লেষণ করে, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এবং ঐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন।
- ✓ এখন থেকে ৫০ বছর আগে (১৯৬০ এর দশকের শেষ পর্যায়ে) গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনসহ ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্থনীতি সমিতির নেতৃস্থানীয়রা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।
- ✓ এখন থেকে ৪৪ বছর আগে, জাতির পিতা হত্যা-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাশাসিত স্বৈরাচারী রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উন্নয়ন অসম্ভাব্যতার কথা লাগাতারভাবে বলেছেন।
- ✓ এখন থেকে ২০-২৫ বছর আগে এদেশে অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-এর উত্থান ও তার কারণ-পরিণাম উদঘাটন করেছেন এবং জনগণকে বুঝিয়ে আসছেন।
- ✓ এখন থেকে ১৫-২০ বছর আগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদী রাজনীতির ভয়াবহতা উদঘাটন করেছেন এবং এ বিষয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে আসছেন।
- ✓ বিগত কয়েকবছর যাবত অনুরূপ অনেক মৌলিক কর্মকান্ডের মধ্যে অর্থনীতি সমিতিই সর্বপ্রথম (১৯ জুলাই ২০১২) জাতীয় সেমিনার করে বলেছে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু বিনির্মাণ সম্ভব (যা এখন বাস্তবে দৃশ্যমান হতে চলেছে)।
- ✓ সমিতিই সর্বপ্রথম বলেছে, বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান যা নব্যউদারবাদী নীতিদর্শনের আওতায় বিচারহীনতার সংস্কৃতি উদ্ভবে সহায়ক।
- ✓ বলেছে, দেশের টেকসই উন্নয়নে "কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের" প্রয়োজনীয়তার কথা। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুই বলেছিলেন, ৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গণমুখী সমবায় গড়ে তোলা হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে গত চার বছর ধরে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করে আসছে। এবং আমরাই এ দেশে সম্ভবত প্রথম ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিকল্প বাজেট "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করেছি। এই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর দর্শনের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত আমাদের সমিতি আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০"।

আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য মোট ৯টি অনুচ্ছেদে আমাদের এই বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করছি। অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ ১: বঙ্গবন্ধু-দর্শনের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধে সিক্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

অনুচ্ছেদ ২: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন দর্শন–রাজনৈতিক অর্থনীতি–বাজেট

অনুচ্ছেদ ৩: অর্থনীতি ও সমাজে ভারসাম্যহীনতা: ধনী-দরিদ্র শ্রেণি বৈষম্য-অসমতা

অনুচ্ছেদ ৪: মূল্যবোধহীন অর্থনীতি জন্ম দিচ্ছে অর্থহীন সমাজ: সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি

অনুচ্ছেদ ৫: বিশ্বায়ন ও নব্য-উদারবাদ: ভাবনা-দুর্ভাবনা

অনুচ্ছেদ ৬: দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন–কেন হচ্ছে, কতদূর হবে?

অনুচ্ছেদ ৭: আসন্ন (প্রচলিত) বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের সুপারিশমালা

অনুচ্ছেদ ৮: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০১৯-২০

অনুচ্ছেদ ৯: আমাদের উপসংহার।

অনুচ্ছেদ ২

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন দর্শন—রাজনৈতিক অর্থনীতি—বাজেট

সরকারের বার্ষিক বাজেট রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের অবিচ্ছেদ্য পথনির্দেশক দলিল। এ কারণেই আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের মর্মবস্তু সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সুপারিশ উত্থাপনের আগে আমাদের রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে গুরুত্ববহ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। উন্নয়ন দর্শনের বাস্তবায়ন অঙ্গ—বাজেট কোন অনড়-স্থির প্রক্রিয়া নয়, তা চলমান-গতিশীল একটি প্রক্রিয়া। আর তাই রাষ্ট্রের উন্নয়ন দর্শনের নিরিখে বাজেটের চলমান-গতিশীল প্রক্রিয়ার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যসহ বিবর্তিত লক্ষ্যটি অনুধাবন অপরিহার্য।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১-এর মহান জনযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ। এদেশে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। আজ থেকে ৪৭ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন

বাংলাদেশে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উৎসারিত এ দুটি প্রত্যাশা বিগত ৪৭ বছরে পূরণ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তিন-চার বছরে দেশ ও জাতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে উন্মুখ ছিলো। কিন্তু, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই আকাঙ্খার "সোনার বাংলাদেশ" গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়। এসবই ঐতিহাসিক সত্য।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারতো, যদি ১৯৭২-এর চার মূলস্তম্ভভিত্তিক সংবিধান বাস্তব রূপ নিতো, এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ কৃষিসহ বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গণমুখী সমবায় ব্যবস্থা চালু হতো তাহলে আজকের বাংলাদেশ আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় মোট দেশজ উৎপাদন ও মাথাপিছু উৎপাদনে অনেক বেশি এগিয়ে যেতো এবং সেইসাথে মানুষে-মানুষে বৈষম্যও হ্রাস পেতো।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তাই-ই নয়, সেই সাথে বহুমুখী ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই ১৯৭৫-পরবর্তীকালের সেনাশাসন, স্বৈরশাসন, সেনাশাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি তোষণ-পোষণ—এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষণা বলছে, "আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেন চালকের আসনে শক্তভাবে বসে পড়েছেন তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন না—যারা অন্যের সম্পদ হরণ, লুণ্ঠন, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি—"রেন্ট-সিকার" হিসেবে সরকার ও রাজনীতি ব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ করে ফেলেছে। এটাই ১৯৭৫ পরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো দুরূহ হবে।"

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট এমন হওয়া উচিত যেন তা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণে সহায়ক হয়। সঙ্গত প্রশ্ন—ঐ বাজেটটি কোন বিষয়কে দার্শনিক ভিত্তি ধরে প্রণীত হবে? যুক্তিসঙ্গত উত্তর হল–ঐ বাজেট হতে হবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন আমাদের "স্বাধীনতার ঘোষণার" সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ; ঐ বাজেট হতে হবে আমাদের ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আর এসবের ভিত্তিতেই প্রণীত হতে হবে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা যার ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা; আর ঐ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি বছর প্রণীত হতে হবে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জন্য সরকারের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান অর্থাৎ বাজেট। সুতরাং,

বাজেট দলিল হতে হবে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পথনির্দেশক দলিল—এটাই স্বাভাবিক। যার বাস্তবায়ন না হলে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা বলা চলে তা হবে মুক্তি-স্বাধীনতার চেতনা বিরোধী। এ অবস্থা আমাদের কোনো বাজেটেই কাম্য নয়।

আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। আমাদের সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল প্রণীত না হলে, সেই মোতাবেক পরিকল্পনা গৃহীত না হলে এবং বাজেট বিন্যস্ত না হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। নব্য উদারবাদী দর্শনের অধীনে মুক্তবাজার ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাংলাদেশে এখন চালু হয়েছে তা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের চেতনা উদ্ভুত সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুক্ত বাজারের উন্নয়ন দর্শন আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে: বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বাড়ছে গুটি কয়েক সুপার ধনী–বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'লুটেরা', "ফাউ খাওয়া শ্রেণি"। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস, কর্মসংস্থানের অভাব, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা—পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিসহ করছে। আইন-শৃংখলা সুস্থিত নয়। আইন-বিচার-সরকার-রাজনীতি বস্তুত রেন্ট-সিকার ক্ষমতাবানদের পক্ষে। দুঃশাসনের মাত্রাতিরিক্ততা সুশাসনকে কাগুজে বুলিতে রূপান্তরিত করছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি নিয়মে রূপান্তরিত হচ্ছে। গুটিকয়েক 'রেন্ট-সিকার' অধীনস্থ করে ফেলেছে রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতিকে। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে না গিয়ে আমরা চলেছি উল্টো পথে। চলেছি এমন এক উন্নয়নের পথে যেখানে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন- উন্নয়ন কোন পথে? কার উন্নয়ন? জনগণের না'কি রেন্টসিকারদের? আর একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে যত কথা হয় তাতে প্রশ্ন জাগে "প্রবৃদ্ধির জন্যই প্রবৃদ্ধি" দিয়ে কি হবে? জনগণের এতে কি লাভ? না'কি গভীরভাবে ভাবা উচিত বন্ধবন্ধু দর্শনের বৈষম্যহ্রাসকারী প্রবৃদ্ধির পথ পদ্ধতি নিয়ে?

'সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা'—এ মূলনীতির মাধ্যমে এক সমতাভিমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে এখনো বহাল আছে। সুতরাং, যৌক্তিক কারণেই সরকারের সকল কর্মকান্ডে বৈষম্য নিরসনমুখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টির সকল উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু, বাজেটে যাই লেখা থাকুক না কেন রেন্টসিকিং উদ্ভুত দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতির কাঠামোতে সরকারি সেবা প্রকৃত বিচারে জনগণের কাছে কতটুকু পৌঁছায় তা এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সতের কোটি মানুষের বাংলাদেশে **"দেশের মাটি থেকে উত্থিত**

উন্নয়ন দর্শন"—"বৈষম্য-অসমতা হ্রাসকারী মানবিক উন্নয়ন দর্শন"-ই হওয়া উচিত আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় দর্শন। কারণ, উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবে : (১) অর্থনৈতিক সুযোগ, (২) সামাজিক সুবিধাদি, (৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (৪) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও (৫) সুরক্ষার নিশ্চয়তা। মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনীতির গতি বাড়াতে হবে, আর অন্যদিকে গতি-উদ্ভুত প্রবৃদ্ধির ফল এমন পথ-পদ্ধতিতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে বৈষম্য-অসমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এজন্য প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত "শোষিতের গণতন্ত্র" ও মানবিক উন্নয়ন দর্শনের প্রতি আস্থা এবং ঐ দর্শন বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। আর এই প্রতিশ্রুতিই জাতীয় বাজেটে দৃশ্যমান হতে হবে।

দেশের অর্থনীতি ও সমাজের সুষ্ঠু অগ্রগতির লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিরাজমান থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈষম্য নিরসন, সবার জন্য ন্যায্যভাবে সামাজিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ ও সুবণ্টিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান। সমাজ রূপান্তরের সমস্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনভিত্তিক হতে হবে। আগেই বলেছি, এদেশে আমরা যেহেতু এ ধরনের একটি সামাজিক বিবর্তন কাঠামো তৈরী করতে পারিনি সেহেতু জাতীয় বাজেটেও তার প্রতিফলন দৃশ্যমান নয়। ফলে, এ যাবতকাল যে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে তা কথার কথাই রয়ে গেছে। পরিকল্পনা ও বাজেট মধ্যস্থতাকারী যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান তা সমাজে অনাকাঙ্খিত বিভাজন সৃষ্টি করছে যার ফলে দেশে দীর্ঘ মেয়াদে আরও বেশি ভারসাম্যহীন, আরও বেশি অস্থিতিশীল এবং আরও বেশি বিশৃংখল পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা আদৌ অমূলক নয়।

অনুচ্ছেদ ৩

অর্থনীতি ও সমাজে ভারসাম্যহীনতা : ধনী-দরিদ্র শ্রেণি বৈষম্য-অসমতা

গত চার দশকে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম-শহরে শ্রেণী কাঠামো বদলে দিয়েছে। একদিকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অবস্থা হয়েছে বেহাল, আর অন্যদিকে অঢেল বিত্ত-সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে গুটিকয়েক ধনীক শ্রেণীর হাতে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে দেশে দারিদ্র্যের হার উত্তরোত্তর কমছে: এখন দারিদ্র্যের হার ২১.২ শতাংশ আর অতি দারিদ্র্যের হার ১১.০ শতাংশ। 'দরিদ্র-দারিদ্র্য' বিষয় নিয়ে অর্থনীতি সমিতিতে আমাদের ভাবনা হ'ল এরকম: বঞ্চিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র, আর 'বঞ্চনার' মানদন্ড হ'ল আমাদের সংবিধান। অর্থাৎ সংবিধানে বিধৃত যে কোন ধরণের অধিকার–অন্ন,

বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজ-কর্মসংস্থান, সমসুযোগ, ন্যায় বিচার প্রাপ্তিসহ আরো যা কিছু আছে–তা থেকে বঞ্চিত মানুষ মাত্রেই দরিদ্র। সরকারি পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি যাই বলুক না কেন, গবেষণা বলছে যে, আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের বহুমুখী (multiple poverty index) মানদন্ডে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষই দরিদ্র-বঞ্চিত (৬৬%), ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত (৩১.৩%), আর অবশিষ্ট ৪৪ লক্ষ মানুষ (২.৭%) ধনী। বিগত তিরিশ বছরে দরিদ্র মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়ন ব্যর্থতারই বহি:প্রকাশ।

ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য–বড় দুর্ভাবনার বিষয় (এবং তা বিশ্বব্যাপি দুর্ভাবনার বিষয়)। গ্রামে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা শহরের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৫ শতাংশ শহরে বাস করেন। গ্রামে ৬০ শতাংশ খানা ভূমিহীন; ৩০ ভাগ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই; ৬০ ভাগ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য সেবা থেকে কার্যত বঞ্চিত। আমাদের নগরায়ন আসলে "বস্তিয়ায়ন" অথবা "শহুরে জীবনের গ্রামায়ন"। নগরায়নের পাশাপাশি এখানে শিল্পায়ন হয়নি—যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দুর্দশা-বঞ্চনা-বিচ্ছিন্নতা। গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্যের এ ধরনটি একদিকে মানুষকে আশাহত করে, মানুষের আত্মশক্তি-আত্মবিশ্বাস সঙ্কুচিত করে আর অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক উগ্রবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর করে। বিগত ৩০ বছরে আমাদের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে ৬০ শতাংশ অথচ দরিদ্র-বিত্তহীন জনসংখ্যা বেড়েছে ৭৬ শতাংশ। বর্তমানে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত, ১ কোটি ৬৫ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং অবশিষ্ট ৮০ লক্ষ উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। বিগত ত্রিশ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৬ শতাংশই দরিদ্র আর ১৪ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত। একই সময়ে মধ্য-মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ। মধ্য-মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬১ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে উপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। বিগত ৩০ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বৃদ্ধির হার ৪৭ শতাংশ আর অতীতের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করছে অদৃষ্টবাদী।

বিগত চার দশকে আমাদের সমাজ-অর্থনীতিতে বহুমুখী দারিদ্র্য যেমন বেড়েছে তেমনি অঢেল বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে গুটি কয়েক ধনীর হাতে। ধনী গ্রুপে (উচ্চ শ্রেণি) এখন জনসংখ্যা হবে ৪৩ লক্ষ ৫৬ হাজার। সম্পদ যে পুঞ্জীভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য বেড়েছে তার অন্যতম উৎকৃষ্ট প্রমাণ মোট জনসংখ্যায় ধনীর আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস: ২৫ বছর আগে মোট জনসংখ্যার ৩.৩ শতাংশ থেকে এখন ২.৭ শতাংশে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে

একটা সংখ্যাস্বল্পদল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী', এদের মধ্যে ১০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনীক শ্রেণীর মোট সম্পদের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা আসলে "রেন্ট-সিকার"– নিজেরা বিত্ত-সম্পদ সৃষ্টি করে ধনী হননি, ধনী হয়েছেন বিভিন্ন ধরনের লুণ্ঠন, দখল, বেদখল, জোর জবরদস্তি-মারপ্যাচের মাধ্যমে। 'রেন্ট-সিকার'দের এ লুটপাট প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত চার দশকে বাংলাদেশের সার্বিক বহুমুখী দারিদ্র্য অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনীক শ্রেণীর মানুষের হাতে। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক "রেন্ট-সিকার" ধনীদের হাতে অঢেল সম্পদ— এসবই বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে অনেক ধরনের জনকল্যাণ বিরোধী ধারা সৃষ্টিসহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

অনুচ্ছেদ ৪

মূল্যবোধহীন অর্থনীতি জন্ম দিচ্ছে অর্থহীন সমাজ : সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনীতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর থেকে দেশ চলেছে উল্টোপথে। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে শুধুমাত্র এক অত্যুচ্চ ধনী রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীই সৃষ্টি হয়নি, পাশাপাশি অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতি সাম্প্রদায়িকীকৃত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে "মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি", "সরকারের মধ্যে মৌলবাদের সরকার", আর "রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলবাদের রাষ্ট্র"। ধর্মের রাজনীতিকরণ অর্থনীতির রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ উপাদান এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রগতিবিমুখ ধারার যৌথক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে মৌলবাদের অর্থনীতি। দেশের মূল অর্থনীতির সব খাত-উপখাতে মৌলবাদের অর্থনীতি শক্তভাবে বিরাজমান। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় তথ্যসহ প্রমাণিত যে: বাংলাদেশে ২০১৬ সালে মৌলবাদের অর্থনীতির নীট মুনাফা ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকা; দেশের মূল অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬-৭ শতাংশ হলে তা মৌলবাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৯-১০ শতাংশ; বিগত ৪০ বছরে মৌলবাদের অর্থনীতির পুঞ্জীভূত মোট নীট মুনাফার পরিমাণ হবে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি; মৌলবাদের অর্থনীতির সদর্প বিচরণ সর্বক্ষেত্রে–আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যখাত, শিক্ষাখাত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, গণমাধ্যম তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয়

সরকার, বেসরকারি সংস্থাসহ ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন জিহাদি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের অর্থনীতি নিরীহ ধার্মিক মানুষের ধর্মানুভূতি নিয়ে ব্যবসা করে এমনকি আপাত অলাভজনক প্রতিষ্ঠানেও মুনাফা করে। তারা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড উদ্ভূত নীট মুনাফার একাংশ ব্যয় করে তাদের পক্ষে রাজনীতি করার জন্য কমপক্ষে ৫ লক্ষ পূর্ণকালীন রাজনৈতিক কর্মীকে বেতন-ভাতা প্রদান করে– এসবই তারা করে ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখল করার লক্ষ্যে।

আমাদের চলমান মূল্যবোধহীন অর্থনীতির আরো একটা মারাত্মক লক্ষণ হলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসহ মৌলবাদের অর্থনীতির সহায়তায় মূল ধারার জ্ঞান-শিক্ষার বিপরীতে পশ্চাৎমুখী ধর্ম শিক্ষার প্রসার। শিক্ষা এখন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকীকৃত। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা ইতোমধ্যে এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের মধ্যে ১ জনই মাদ্রাসার ছাত্র। এসবই হলো ভবিষ্যতে ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বর্তমানে বিনিয়োগ। ধর্মভিত্তিক শক্তি তাদের লক্ষ্য অর্জনে শক্তিশালী এক ত্রিভুজের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে কাজ করে। যে ত্রিভুজের মাথায় কর্পোরেট হেড অফিস হিসেবে আছে জামায়াত-ই-ইসলাম, আর নীচের এক বাহুতে আছে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে পরিচালিত ১৩২টি সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠন আর অন্য বাহুতে আছে মৌলবাদের অর্থনীতি এবং বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসহ ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা। উল্লেখ্য যে, ধর্মভিত্তিক জঙ্গীত্ব এখন দেশ-ধর্ম নির্বিশেষে বৈশ্বিক রূপ নিয়েছে। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের বৈশ্বিক সাম্রাজ্য অটুট রাখা ও তা সম্প্রসারণের অন্যতম কৌশল (একমাত্র কৌশল নয়)।

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদয়িকতা ও সংশ্লিষ্ট মৌলবাদ-জঙ্গিত্ব যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরুদ্ধ, সংবিধান বিরুদ্ধ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিরুদ্ধ সেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শন বিনির্মাতাদের অবশ্যই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। এ ভাবনা সরকারের বার্ষিক বাজেটেও প্রতিফলিত হতে হবে। বাজেটকে স্পষ্টভাবে সে পথনির্দেশ দিতে হবে যে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণবিমুখ অর্থনীতি ও রাজনীতি উচ্ছেদে আশু ও স্বল্পমেয়াদি "ক্ষতি হ্রাস কৌশল"(damage minimizing strategy) ও "ঝুঁকি হ্রাস কৌশল" (risk reduction strategy) সমূহ কি কি এবং একই সাথে দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের নীতি-কৌশলসমূহ কি এবং এসবে কোন খাতে ব্যয় বরাদ্দ কত হবে, আর তা সুসমন্বিতভাবে কিভাবে বাস্তবায়িত হবে। আর এসব এড়িয়ে চললে "মূল্যবোধহীন অর্থনীতি প্রগতিবিরুদ্ধ অর্থহীন সমাজ কাঠামোকে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন" করতেই থাকবে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ পরিপুষ্ট হতেই থাকবে যা এক সময় রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখলে উদ্যত হবে। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ উদ্দিষ্ট বাজেটসহ সকল নীতি-নির্ধারণী দলিলপত্রে এ বিষয় যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৫

বিশ্বায়ন ও নব্য-উদারবাদ : ভাবনা-দুর্ভাবনা

আমরা এখন এক "অন্যায্য" বিশ্বায়নের আওতায় বাস করছি। সাথে আছে বাজার অর্থনীতি আর বৈশ্বিক রেন্ট সিকিং ব্যবস্থা। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ স্পষ্ট বলেছেন, "বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না, ...বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভন্ডামির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে"। আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন, "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে"। এ অবস্থায় আমাদের বাজেটকে বলতে হবে বিশ্বায়নের এ যুগে কিভাবে আমরা আমাদের ন্যায্য হিস্যা সর্ব্বোচ করতে পারি যা আমাদের দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা দূরসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন-প্রগতি ত্বরান্বিত করবে। একথা সত্য যে, বিশ্বায়নের আওতায় বিশ্ববাণিজ্য, বৈশ্বিক সম্পদের চলাচল পারস্পরিক বিশ্ব-নির্ভরতাকে অনিবার্য করে তুলেছে। কিন্তু, বিশ্বায়নের আওতায় বৈশ্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য যেমন ক্রমবর্ধমান তেমনি জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায়ে টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব এক প্রস্তাবনা। শুধু তা-ই নয়; প্রচলিত অন্যায্য এই বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বের দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে প্রতিবাদী আবহ, প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর, বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, আবার এসবের পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ- গোষ্ঠীভিত্তিক জঙ্গিবাদী তৎপরতা।

আজকের বিশ্বব্যবস্থার মূল ভিত্তি দর্শন—মুক্তবাজার, মুক্তবাণিজ্য, মুক্তকর্ম প্রচেষ্টাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকোচনকারী "নব্য উদারবাদ" যৌক্তিক ব্যর্থতার কারণেই বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সমালোচিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ১৯৯২ সালে লিখেছিলেন নব্য-উদারতাবাদই চিরস্থায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা; বলেছিলেন অন্য কোনো ব্যবস্থা একে কোনো দিন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে হঠাতে পারবে না। তিনিও এখন এই ব্যবস্থার কড়া সমালোচক। আর অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলেছেন—বিশ্বায়ন কাজ করছে না; বিশ্বায়ন সৃষ্টি করছে বৈশ্বিক রেন্ট-সিকারদের এক গোষ্ঠী; বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপি বৈষম্য বাড়াচ্ছে; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ত্ব আইন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি ইত্যাদি। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদদ্বয় জোসেফ স্টিগলিজ ও পল ক্রগম্যান এবং সেইসাথে বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের গুরু নোয়াম চমস্কি—সবাই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বলছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%"— এসব খুবই মারাত্মক "উন্নয়ন" প্রবণতা। এই ব্যবস্থায় বিশ্বের নেতৃত্ব ও সকল ক্ষমতা ও বিশ্বসম্পদের সিংহভাগ থাকছে উন্নত বিশ্বের হাতে আর জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ে একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাধর রেন্ট-

সিকার শ্রেণির হাতে চলে যাচ্ছে রাষ্ট্রের, রাজনীতির ও অর্থনীতির সর্বময় কর্তৃত্ব। তারা হয়ে উঠছেন কতিপয়তন্ত্রে কর্তৃত্ববাদী আধিপত্যবাদী।

বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার ও মুক্ত বাণিজ্যের রথযাত্রায় আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ইতোমধ্যে উঁচুমাত্রায় পৌঁছে গেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। উন্নয়নের এই পথ টেকসই নয়। বিরাজমান বৈষম্যবর্ধক প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সংঘাত-সংঘর্ষ বাড়বে, কমবে না। তাই উন্নয়ন দর্শনে মৌলিক সংস্কার জরুরি। আর এই সংস্কারের মূল মন্ত্র হবে বিরাজমান ও বিকাশমান অ-টেকসই বাস্তবতার বিপরীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে সরকারের সকল কর্মকান্ডে বৈষম্য-নিরসনমূখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে। অর্থনীতিতে এমন কোন নীতি গ্রহণ করা ঠিক হবে না যার সামাজিক অভিঘাত ঋণাত্মক। রেন্টসিকিং-দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটিয়ে সরকারি সেবা সাধারণ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তথা সামাজিক বিবর্তনের সকল প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে বসাতে হবে যেখানে স্বদেশজাত মানবিক উন্নয়নই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়। এটাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন; এটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন দর্শন। বাজেটে এ উন্নয়ন দর্শনই প্রতিফলিত হতে হবে।

স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে নব্য উদারবাদের অন্ধ অনুসরণের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থাও জনকল্যাণকামী হচ্ছে না। এটা নব্য উদারবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। সরকারি বক্তৃতা-বক্তব্যে দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ স্বীকৃত হলেও সরকারি কর্মকান্ড মূলত রেন্টসিকিং গোষ্ঠীর আদেশ-নির্দেশে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকাঠামোর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত। দেশে আইনের শাসনের অভাব দৃশ্যমান; 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' ক্রমবর্ধমান; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব সর্বত্র; স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অকার্যকর। কেন্দ্রীভূত সরকার চায় না স্থানীয় সরকার কার্যকর হোক, শক্তিশালী হোক অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ১১, ৫৯, ৬০ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে "গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু"। বাজেটে উন্নয়নউদ্দিষ্ট এসব নিয়ে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা থাকবে– এ আশা আমরা করতেই পারি।

নব্য-উদারবাদী প্রেসক্রিপশন অনুসরণে আমরা আজ যেখানে পৌঁছেছি তা সংঘাতময় পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী করার পূর্ব লক্ষণ। সামগ্রিক পরিবেশ যা তাতে প্রকৃত মানব উন্নয়নকামী, বৈষম্য হ্রাসকারী জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন সহজসাধ্য কাজ নয়। পিছিয়েপড়া মানুষের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বরাদ্দ নির্ধারণ করা হলেও তার সিংহভাগ মধ্যসত্ত্বভোগীরা হাতিয়ে নেয়। উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে তার সামান্য অংশই পৌঁছায়। অধিকাংশ সময়ে তারা জানেনই না তাদের জন্য বাজেটে কি বরাদ্দ আছে, কোন খাতে এবং কেন। আমরা আশা করবো আসন্ন বাজেটে এসব বাস্তব সমস্যার নির্মোহ বিশ্লেষণসহ

উত্তরণের স্পষ্ট পথ নিদের্শনা থাকবে। এটাই হবে জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

জনকল্যাণধর্মী জনঅংশীদারিত্বভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন তথা মানবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়ন এবং সাযুজ্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরি। যতদিন না তা ঘটে ততদিন গতানুগতিক বাজেট তৈরী হতে থাকবে এবং গতানুগতিক খন্ডিত আকারে এবং মূলত ক্ষমতাধর রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্তদের স্বার্থে তা বাস্তবায়িত হবে। আর পিছিয়েপড়া বিশাল জনগোষ্ঠী উপেক্ষিতই থেকে যাবে। আমরা এ অবস্থার পরিবর্তন আশা করি।

অনুচ্ছেদ ৬

দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন– কেন হচ্ছে, কতদূর হবে?

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়টি গবেষকদের কাছে বেশ দুর্বোধ্য এক প্যারাডক্স বা স্ববিরোধ। কারণ দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে এ রকম হবার কথা নয় বলেই অনেকে মনে করেন। সামষ্টিক অর্থনীতির অনেক মানদন্ডে, যেমন জিডিপি, প্রবৃদ্ধি হার, মূল্যস্ফীতি–এসবের নিরিখে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন সত্ত্বেও আমাদের উন্নয়ন রেকর্ড খারাপ নয়। আর সামাজিক উন্নয়নের বেশ কিছু মানদন্ডে যেমন শিক্ষার হার, জীবনের আয়ু, নারীর ক্ষমতায়ন–আমাদের অবস্থা প্রতিবেশী অনেকের চেয়ে ভাল (অথবা খারাপ নয়)। উন্নয়ন গবেষকদের অনেকেই এসব নিয়ে যথেষ্ট ভাবছেন যে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্জনটা "এত ভালো কিভাবে হলো"? এ নিয়ে আমাদের তথ্য নির্ভর নির্মোহ ধারণা হল বিগত ১০ বছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকার বৈশ্বিক মুক্তবাজার কাঠামোর মধ্যে থেকেই তুলনামূলক উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্থনীতি, অবকাঠামো উন্নয়নে মেগা প্রকল্প এবং সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তা বেষ্টনী বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রেখেছে মূলত: কৃষক ও শ্রমিক–যার মধ্যে আছেন গ্রামের কৃষক, শহরের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শ্রমিক–প্রধানত তৈরি পোশাক শিল্প ও বস্ত্র শিল্প খাতের শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষ, এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিক (যারা ২০১৮ সালে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ২৯৩ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়েছেন; ডলারের বিনিময় হার ৮২ টাকা ধরে)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে–এ সবের পাশাপাশি আমাদের অন্য একটি নিমোর্হ ধারণা আছে। ধারণাটি হলো বাংলাদেশের অবস্থা আরো অনেক ভাল হতে পারতো যদি বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যা না করা হতো এবং যদি একই সাথে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-উদ্ভূত উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নের সুযোগ পেতো। এ নিয়ে আমাদের সম্পুরক ধারণাটি এরকম যে অনেক মানদন্ডে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন-অগ্রগতি

হয়েছে তা দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে সম্ভব হলেও অধিকতর উন্নয়ন এবং তা ধরে রাখতে হলে ভবিষ্যতে সুশাসন অপরিহার্য, এবং সামনে বৈষম্য-হ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শন নিয়ে এগুতে হবে। উল্লেখ্য নব্য-উদারবাদী উন্নয়ন দর্শন গ্রহণ করে আমাদের পক্ষে ভবিষ্যতে কতদূর এগুনো সম্ভব হবে এ প্রসঙ্গে দু'টো সাবধান–কথা বলা জরুরি: (১) আজকের উন্নত দেশসমূহ তাদের নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়নে সমসাময়িককালে কখনও নব্য-উদারবাদী মতবাদ গ্রহণ করেনি, বিপরীতে নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionist policies) অবলম্বনে তারা উন্নয়নের আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। (২) "বস্তুজাগতিক প্রগতি ঐ বিন্দু পর্যন্তই মানবকল্যাণ বাড়াবে, যখন তা নৈতিক-বস্তুর সংখ্যা কমাতে থাকবে" ("Material progress will increase the welfare of the universe upto the point when it starts to diminish the quantity of ethical goods", বলেছেন অর্থশাস্ত্রের গুরু জন মেইনার্ড কেইনস্)। এসবই আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৭

আসন্ন (প্রচলিত) বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের সুপারিশমালা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। অতীতে, বিগত চার অর্থবছরের আগে, আমরা কখনও "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করিনি এবং সম্ভবত অন্য কোন সংগঠনও এখন পর্যন্ত এ কাজটি করেনি। অর্থাৎ সংস্কৃতিটাই ছিল এমন যে প্রতি বছর জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একবার কয়েক ঘন্টাব্যাপি খসড়া বাজেট (Draft Budget) পেশ করবেন আর আমরা বাজেটের আগে কিছু বিশ্লেষণ-সুপারিশ পেশ করবো যার অধিকাংশই গৃহীত হবে না। পরবর্তীকালে সংসদে বাজেট অধিবেশনের পরে অর্থমন্ত্রী মহোদয় একটি বাজেট বিল আনবেন যা হাতচাপড়ে পাশ হয়ে যাবে–কিন্তু আমরা জানবো না কয়েক ঘন্টাব্যাপি বক্তৃতায় যে খসড়া বাজেট পেশ হল আর যেটা হাতচাপড়ে চুড়ান্ত বাজেট বলে পাশ হল–এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কি? অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমরা আরও একবার হতাশা ব্যক্ত করবো। এবারো হয়তো তাইই হবে।

জাতীয় বাজেট নিয়ে হতাশা ও অস্বচ্ছতার এ সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের জন্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছি যে এ দেশের সকল অর্থনীতিবিদদের পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে আমাদের অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত "মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন ও তা জনসম্মুখে উপস্থাপন করা"। এবারে আমরা একনাগাড়ে পঞ্চমবারের মত সেই উদ্যোগই নিয়েছি। তবে যেহেতু আমাদের প্রস্তাবনা যথেষ্ট মাত্রায় মৌলিক ও ধনাত্মক

সমালোচনামূলক (ক্রিটিক্যাল) সেহেতু আমরা আশা করছি না যে এ প্রস্তাব গৃহীত হবে। সে কারণেই আমাদের বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের আগে এক ধরনের সমঝোতার স্বার্থে আসন্ন চিরাচরিত বাজেটের জন্য কয়েকটি সুপারিশ উত্থাপন করছি। এখানে বলে রাখা দরকার যে আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশমালা আমরা ইতোমধ্যে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাক্ষাতপূর্বক তাকে লিখিতভাবে জানিয়েছি এবং ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়কে সাক্ষাতপূর্বক লিখিতভাবে জানিয়েছি। এসব সুপারিশ পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটেও অন্তর্ভুক্ত আছে বলে ধরে নেয়া যায়।

আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে বিবেচনার লক্ষ্যে আমাদের সুপারিশগুচ্ছ নিম্নরূপ:

উন্নয়ন-এর দিকনির্দেশক দলিল

৭.১ জাতীয় বাজেট– উন্নয়ন-এর দিকনির্দেশক দলিল। সে কারণেই চূড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট হতে হবে যে বাজেটে আয়-ব্যয় বিন্যাসসহ বিভিন্ন নীতি-কৌশল সংশ্লিষ্ট যে সব দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে তার ফলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির কোনটি কি মাত্রায় অর্জিত হবে : বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; অধিকতর কার্যকরী, বৈচিত্রপূর্ণ উৎপাদনশীল কৃষি; অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা; শিল্পায়ন: অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ (স্ব-কর্মসংস্থানসহ) এবং শিল্পে শ্রমিকের মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব; কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার; নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন; বাণিজ্য ও পণ্য বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস এবং মূল্য সংযোজনভিত্তিক সমানুপাতিক হিস্যা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম জনকল্যাণকর ব্যবহার; মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদির মাধ্যমে জন-সংখ্যাকে মানব-সম্পদে রূপান্তর; শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নয় উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবাসহ শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাত; সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতিসহ সুসংগঠিত সামাজিক বীমা পদ্ধতি; রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গণমুখী রূপান্তর; এবং রাষ্ট্রীয়-সরকারি উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়ন আন্দোলন।

সম্প্রসারণমুখী বাজেট

৭.২ উন্নয়ন কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে আমরা অতীব গুরুত্ববহ মনে করি। এ গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে কারণ আমরা সামনের ২০ বছরের মধ্যেই স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়ে উন্নত দেশে উন্নীত হতে চাই। যে কারণে আমরা বিশ্বাস করি সংকোচনমূলক নয় বাজেট হতে হবে উত্তরোত্তর সম্প্রসারণমুখী। তবে সম্প্রসারণমূখী বাজেটের কাঠামোগত বিন্যাস যেন জনকল্যাণকামী ও

অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল শক্তিশালী করার দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিকে সমর্থন দেয়ার জন্য মুদ্রানীতি তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যুক্তিসংগত প্রয়োগ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি কম রাখার চেষ্টা করতে হবে, তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এদিকে নজর দেয়া প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি সংযত করবে নাকি সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিকে সহায়তা দিতে সুদের হার কমিয়ে রেখে বৃদ্ধি করবে অর্থপ্রবাহ এই 'ট্রেড অফ'-এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের কড়া নজর রাখা এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে রাজস্ব নীতিকে লাগসই করতে হবে।

বাজেটের প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক

৭.৩ বরাবরের মতোই বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মত এবং মানসম্মত বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন কার্যকারীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রণীত বাজেট বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সূচারুভাবে প্রতিপালন করতে হবে-অন্যথা হলে উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকতে হবে। বাজেট সুষ্ঠুভাবে সময়মত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা, সমন্বয় ও পরীবিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির পথনির্দেশ বাজেটে থাকতে হবে।

দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি

৭.৪ আসন্ন বাজেটে সামনের অর্থবছরের জন্য মোট প্রকৃত দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হবে হয়তো বা ৮.০-৮.৫ শতাংশ। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় যে সব "অনুমান" উল্লেখ করা হবে তা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত পদক্ষেপসহ উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা বাড়ানো যায়। তবে "প্রবৃদ্ধির জন্যই প্রবৃদ্ধি" নয় 'বৈষম্যহ্রাস উদ্দিষ্ট প্রবৃদ্ধি' অথবা "প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বৈষম্য হ্রাস"–এ দিক নিদের্শনা বাজেটে স্পষ্ট থাকতে হবে।

বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি

৭.৫ আসন্ন বাজেটে বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি হয়তো বা ৫.০-৬.০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব আসবে। এ প্রস্তাব শর্তাধীনে বাস্তবায়নযোগ্য চ্যালেঞ্জ। আমাদের দেশে যেহেতু কৃষি ও কৃষক এখন আর সমার্থক নয় সেহেতু কৃষকের অবস্থা যাই হোক না কেন খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে পারে। আর অন্যদিকে সহায়ক মুদ্রানীতির

প্রভাবে খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। শুধু সহায়ক মুদ্রানীতি নয়, সাথে সাথে অন্য কিছুও ভাবতে হবে-যে পথে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে, যে পথে অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং একই সাথে কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাবেন, এবং যে পথে বৈষম্য-হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। কৃষক যদি তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পান সেক্ষেত্রে ভোক্তা স্তরে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি হয় না, কিন্তু কৃষক তো সর্বস্বান্ত হন এবং কৃষক পর্যায়ে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়ে। এ ধাঁধার উত্তর বাজেটে থাকতে হবে। এ দেশে প্রকৃত কৃষক যদি ভর্তুকিসহ অন্যান্য প্রণোদনা না পান সে ক্ষেত্রে অন্য কারো ভর্তুকি পাবার অধিকার নেই– এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করে বাজেটে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। তবে একই সাথে ভর্তুকি বৈষম্য হ্রাসের পথ-পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হবে।

৭.৬ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাস

অর্থনীতিশাস্ত্রের ভাষা যাই হোক না কেনো মানুষের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা অথবা বেকারত্ব দূর করা– আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। "সংবিধান" আর "অর্থনীতি"–একই সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নাও হতে পারে। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সবার জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের বাজেট প্রণয়নে স্মরণ করা জরুরি যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: "এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়"। উল্লেখ্য যে, কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের যেমন অর্থনৈতিক যুক্তি আছে তেমন তার চেয়ে বেশি আছে সামাজিক যুক্তি। তবে অর্থনীতি সমিতিতে আমরা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করতে অর্থনৈতিক যুক্তি নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি। বেকার তরুণ-তরুণিরা বেকারত্বের কারণে হতাশ-নিরাশ-দিশেহারা-পথহারা হতেই পারে–এ তাদের দোষ নয়। সম্ভবত দোষ সিষ্টেমের যা তাদেরকে বেকার-আধাবেকার-ছদ্ম বেকার করে রাখে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ জরুরি। অর্থনীতির ভাষায় বিষয়টি জটিলও নয় দুর্বোধ্যও নয়। বিষয়টি এরকম: মোট দেশজ উৎপাদন অথবা জিডিপি বৃদ্ধিতে কয়েকটি উৎস ভূমিকা রাখে যার মধ্যে আছে ক্রমবর্দ্ধমান কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, শ্রমের ফলপ্রদতা ও প্রযুক্তি। তবে এ সমীকরণে শ্রমের ফলপ্রদতা ও প্রযুক্তির ভূমিকা এখনও তুলনামূলক স্বল্প মাত্রা। বিষয়টি মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার (total factor productivity)। মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো সামাজিক পুঁজির অবস্থা, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, জাতীয় জ্ঞান ভান্ডার, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ এক কথায় জ্ঞানভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের

অবস্থান। উল্লেখ্য যে আমাদের দেশসহ অনেক দেশেই - শ্রমের ফলপ্রদতা ও প্রযুক্তির ভূমিকা এখনও কাঙ্খিত মাত্রায় নয়।

সরকারি পরিসংখ্যান যা বলছে তাতে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ। বেকারের সংজ্ঞা হিসেবে সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর অথবা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কি ব্যবহার করলো তা স্পষ্ট নয়। সরকারি হিসেবে দেশে এখন বেকার মানুষের সংখ্যা ২৬ লাখ। কিন্তু আমাদের হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি ২টি খানায় ১ জন বেকার মানুষ আছেন (তরুণ-তরুণি)। অর্থাৎ দেশে যদি সাড়ে ৩ কোটি খানা হয়ে থাকে তাহলে বেকার মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ। এ ক্ষেত্রে ঐসব বেকার তরুণ-তরুণিদের নিয়ে ভাবনা কী? তারা বেকার থেকে সকার হলে তো অর্থনীতি বিকশিত হবে– এ নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঐসব তরুণদের প্রযুক্তি শিক্ষা নেই অথবা ব্যবসা-বানিজ্য বিকাশ অথবা ত্বরান্বয়নের শিক্ষা নেই–এসব অজুহাত যথেষ্ট মাত্রায় ঠুনকো। কারণ শ্রম ঘন শিল্পে শ্রম চাহিদা এখনও অনেক। এ সব কারণে আমাদের প্রস্তাব হলো : (১) সকল বেকার তরুণ-তরুণিদের সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে, যা শুধুমাত্র দেশের মোট জিডিপি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তাই নয়, যা দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিকসহ সুস্থ বিকাশেরও সহায়ক হবে, (২) ঐ সব বেকার তরুণ-তরুণিদের যে ধরণের শিক্ষা-জ্ঞান প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে, (৩) প্রয়োজনে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে – যা সরকার-রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব (যদি রাষ্ট্র সংবিধানের সাথে সাযুজ্য রেখে চলতে বদ্ধপরিকর হয় এবং কর্মসংস্থান নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে)। স্বাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে বেকার মানুষ যেই হোক না কেন তার কর্মসংস্থানের চিন্তা-বিবেচনা যেহেতু অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় দৃষ্টিতেই গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এ বিষয়ে বাস্তবমূখী চিন্তা-বিবেচনা বাজেটে থাকতেই হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বেকারত্ব হ্রাসে অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি আমাদের সুপারিশ হল "জাতীয় কর্মসংস্থান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কোষ" গঠন করা। বিষয়টি আসন্ন বাজেট প্রস্তাবনায় থাকা সমীচীন।

সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের আর্থিক বিবরণী

৭.৭ সকল মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্ব-স্ব আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বর্তমানে মন্ত্রণালয়গুলো এই আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন করে না। এ ক্ষেত্রে পাইলট ভিত্তিতে একটি মন্ত্রণালয়ে "আর্থিক বিবরণী মডেল" করে তা মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পরে বাকী ৪২-টি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে সব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিবরণী সংযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের "সংহত আর্থিক বিবরণী" প্রণয়ন করা যেতে পারে। আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরে

তুলনামূলক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিরবণী প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া প্রয়োজন। পরবর্তী বছরগুলোতে পরিকল্পিতভাবে সময় বেঁধে দিয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

পৌরসভাগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৭.৮ দেশের পৌরসভাগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নে মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যানসিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোতেও অনুরূপ মানসম্মত আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ফাইন্যানসিয়াল রিপোর্টিং মডেল প্রণয়ন জরুরি। এ বিষয়ে রুলস্ অফ বিজনেস-এর বাস্তবায়ন দরকার।

দাপ্তরিক বিকেন্দ্রীকরণ

৭.৯ দেশে যে ভাবে সবকিছু এককেন্দ্রিক বা ঢাকামূখী হচ্ছে তা উন্নয়ন সহায়ক নয়। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব হল: অর্থনীতির অনেক মৌলিক কর্মকান্ড (শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি) থেকে শুরু করে অনেক প্রশাসনিক কর্মকান্ড (দপ্তর, অধিদপ্তর, এমন কি মন্ত্রণালয়) ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করা যুক্তিসঙ্গত। বিষয়টি আসন্ন বাজেটে স্থান পাবার যোগ্য।

ঘুষ-নীতির বিলুপ্তির প্রস্তাব

৭.১০ আমরা গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের প্রতি সম্মান রেখে সরকারের আয়-ব্যয় সংশ্লিষ্ট 'ফিসক্যাল কর্মকর্তাদের" স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করে ঘুষ-নীতি বিলুপ্তির লক্ষ্যে "দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-সহিষ্ণুতা" (zero tolerance) দৃশ্যমান করার প্রস্তাব করছি।

পরিচালন ব্যয় কমানো

৭.১১ পরিচালন ব্যয় কমানো নিয়ে বাজেটে সুস্পষ্ট দিক নিদের্শনা থাকে না। বিষয়টি বাজেটে স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাত ও দক্ষতা এবং রাষ্ট্র

৭.১২ সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় এ-দুটো খাতে সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশে প্রবল। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বারংবার বলে আসছে যে, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। এ প্রবণতা বন্ধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের

লক্ষ্যেই নয়, সেইসাথে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রিতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যেও। এ সব কর্মকান্ড "ব্যবসা ব্যয়" (Cost of doing bussiness)-হ্রাস এবং "ব্যবসা সহজীকরণ (Ease of doing bussiness)-এ সহায়ক হবে; অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়বে, বাড়বে কর্মসংস্থান। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অবৈধ পথে- কালো পথে উৎপাদনশীল খাত থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছেন। আবার আমাদের এসব কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা ক্ষুদ্রায়তন সরকারের পক্ষে; আমরা কোন অর্থেই রাষ্ট্রকে নেহায়েত 'নৈশ প্রহরি' বানানোর পক্ষে নই। আমাদের মতে রাষ্ট্র মানে শুধুমাত্র আইন প্রণয়নকারী (Legislative) এবং নিয়ন্ত্রণকারী (regulator) নয়, রাষ্ট্র মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের প্রধান প্রতিষ্ঠান যা পরিচালিত হবে বঙ্গবন্ধু-দর্শনের মূলভিত্তি "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক" নীতির ভিত্তিতে। আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত "দেশজ উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে তার তিনটি বৃহৎবর্গীয় স্বাধীন, দেশপ্রেমিক ও পরস্পর সম্পর্কিত অঙ্গ– আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহি বিভাগ (Legislative, Judiciary, Executive)–সমূহকে উত্তরোত্তর অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে; এসব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করতে হবে আর্থিক বিচারে শক্তিশালী এবং নৈতিকভাবে জনকল্যাণকামী। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ উত্তরোত্তর জনকল্যাণকামী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাজেটে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্পষ্ট করা জরুরি।

৭.১৩ সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় যৌক্তিকিকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া জরুরি বলে আমরা মনে করি: (ক) জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণ; (খ) ঢাকাসহ দেশের সকল সিটি করপোরেশনে 'সিটি গভর্নমেন্ট' গঠন এবং রাজউক (উত্তর ও দক্ষিণ), চ.উ.ক, বা.উ.ক, খু.উ.ক, এর মতো আলাদা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা; এবং (গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজস্ব আহরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর/ফিস্ আহরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং তা স্থানীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা।

৭.১৪ সরকারি প্রচলিত সংগ্রহ পদ্ধতির দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান পদ্ধতি দীর্ঘসূত্রীতামূলক, ব্যয় বৃদ্ধিমুখী এবং অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত

নিম্নমানের দ্রব্য ও সেবা প্রদানপ্রবণ। বর্তমান ব্যবস্থায় সরবাহকারী ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সরকারি অফিসে উপস্থিত হয়ে দরপত্র জমা দিতে হয়। সরকারি/প্রভাবশালী মহলের আশীর্বাদপুষ্ট যারা তাদের কাজ পাওয়ার অগ্রাধিকার থাকে এবং অধিক দক্ষ ঠিকাদারকে দরপত্র জমা দিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি তারা প্রাপ্ত কাজ নিজেরা না করে সাবকন্ট্রাক্ট এর সাহায্য নেয়। এর পরিবর্তে ইলেকট্রনিক সরকারি সংগ্রহ (e-GP) পদ্ধতি অধিক ব্যয়সাশ্রয়ী। এই পদ্ধতিতে দ্রব্য ও সেবার মূল্য প্রায় শতকরা ১২ ভাগ কম হয়। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সরকারি সংগ্রহ ও দরপত্র (e-Gp, e-tendering) ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। তবে এসব নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ দেখা যাচ্ছে। সরকারি সংগ্রহ ও দরপত্র ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে চালু হওয়ার ফলে যে সব সমস্যা দেখা যাচ্ছে তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়টি বাজেটে উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষা খাতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ব্যয় এবং দেশ রক্ষায় জন-অংশগ্রহণ

৭.১৫ প্রতিরক্ষা খাতের 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে 'অদৃশ্যমান' ব্যয় হয়ে থাকে তা যেহেতু আমাদের জানার উপায় নেই তাই আমাদের পক্ষে প্রতিরক্ষা খাতে মোট সরকারি ব্যয় শুধু অনুমানই সম্ভব। আমরা মনে করি বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের স্ফীতি মানব উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতিকে প্রকৃত বিচারে ব্যাহত করে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ইস্যুটিকে আমরা যেভাবে দেখি তা'হলো— প্রতিরক্ষা খাতে ক্রমবর্ধমান সরকারি ব্যয়ের সাথে মানব উন্নয়ন ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে ব্যাপক মাত্রার দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা, মানব উন্নয়ন কর্মকান্ডে কাঙ্খিত মাত্রার তুলনায় ধীরগতি এবং সরকারি ব্যয়-বরাদ্দে ভারসাম্যহীনতার কারণে ধাপে ধাপে প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। 'দেশ রক্ষা' জনগণের পবিত্রতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ বিবেচনা থেকে আমাদের প্রস্তাব হল কলেজ পর্যায় থেকে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে অথবা ১৮-২২ বছর বয়সী প্রত্যেক তরুণ-তরুণিকে 'দেশ রক্ষার' অথবা 'প্রতিরক্ষার' জন্য কমপক্ষে একবছর মেয়াদী সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ-এর ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত। আর এ কর্মসূচীর নামকরণ হতে পারে "তরুণ-তরুণিদের জন্য বাধ্যতামূলক দেশরক্ষা, প্রতিরক্ষা কর্মসূচী"। পৃথিবীর বহু দেশেই এ ধরণের কর্মসূচী যথেষ্টমাত্রায় ফলদায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে একথা আমরা বহু বছর ধরে বলে আসছি।

বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি

৭.১৬ "সরকারি খাত মানে অদক্ষ আর বেসরকারি খাত মানেই দক্ষ"–এ ধারণাটি সঠিক নয়। এ কথা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত যে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ প্রাইভেট (বেসরকারি) বরাদ্দের চেয়ে খারাপও নয় এবং তা ব্যক্তি খাতের বরাদ্দের জন্য বাধাও নয়। এসব ঐতিহাসিক বিবেচনা মাথায় রেখে আমরা মনে করি বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম পথ হল অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ "ব্যবসা-ব্যয়" কমিয়ে আনা (Cost of doing business) এবং "ব্যবসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ" (Ease of doing business) করা। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ বিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ হলো: শিল্প স্থাপনের জন্য ভূমি প্রাপ্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইন-শৃংখলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে "ঝুঁকি হ্রাস কৌশল" ও "ক্ষতি হ্রাস কৌশল", বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসসহ দলিল-দস্তাবেজ প্রক্রিয়াকরণ সহজ করা, ব্যবসা ত্বরান্বিতকরণ সংশ্লিষ্ট নীতিসহায়ক পদক্ষেপ ইত্যাদি। 'ব্যবসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ'-এর ক্ষেত্রে আমরা মনে করি তিনটি বিষয় বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ: (১) 'ব্যবসার প্রক্রিয়াগত' দিক (process অর্থে) যেখানে অপ্রয়োজনীয় ধাপসমূহ কমিয়ে আনতে হবে, (২) "সময়গত দিক" (time factor অর্থে) যেখানে অযথা সময়ক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে, (৩) "ব্যয়গত দিক" (cost) যেখানে অযথা-যুক্তিহীন ব্যয় অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয় সম্পর্কে বাজেটে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি।

রপ্তানী: বহুমুখীকরণ, নতুন গন্তব্যস্থল এবং 'ভ্যালু চেইনে' অধিকতর অর্ন্তভূক্তি

৭.১৭ রপ্তানী-বাস্কেট বহুমুখীকরণ এবং সেই সাথে যারা উচ্চ-মূল্যের রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করবেন তাদের যুক্তিসিদ্ধ প্রণোদনা প্রদানের বিষয় বাজেট বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন।

৭.১৮ রপ্তানীর জন্য নতুন গন্তব্য দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

৭.১৯ গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে অধিকতর ও কার্যকর অংশিদারিত্ব নিশ্চিতকরণে বৈদেশিক বিনিয়োগ-বান্ধব কর্মকৌশল নির্ধারণ ও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

আর্থিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাজার

৭.২০ পুঁজিবাজারে ধ্বসের পরে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ফিরে আসা এখনও দৃশ্যমান নয় এবং পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। পুঁজিবাজারের সমস্যা শুধু সরবরাহ ঘাটতিই নয় চাহিদা

স্বল্পতাও। পুঁজিবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব আছে। সরকারি ও কর্পোরেট বন্ড মার্কেট সৃষ্টির কথা ভাবা জরুরি। একই সাথে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বন্ড প্রচলনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এসব কার্যক্রম গ্রহণ করলে একদিকে স্টক বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমবে অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণে সক্ষম হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অধিকতর কার্যকর মিউচুয়াল ফান্ডের কথা ভাবা যেতে পারে। বিষয়সমূহ বাজেটে উল্লেখ প্রয়োজন।

৭.২১ পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়সহ নিয়ন্ত্রক সংস্থার জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নে আর্থিক ও নীতিগত প্রণোদনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৭.২২ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা মূলত ব্যাংক নির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেটের সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয়। অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের যৌক্তিক অর্থায়ন যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিকট অতীতে সংগঠিত ব্যাংকিং অঘটনসমূহ আগ্রহী ব্যাংকারদের ঋণ প্রদানে অনুৎসাহী করছে আবার অন্যদিকে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের অভাবে এবং ঋণের তুলনামূলক উচ্চ সুদ হারের কারণে (যদিও সরকারিভাবে সুদ হার হ্রাস করার কথা হচ্ছে) ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যেও ঋণ গ্রহণের উৎসাহ কম। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারকে সম্মিলিত উদ্যোগে নীতি-কৌশল উদঘাটন করতে হবে। ব্যাংকিং শৃংখলা নিশ্চিতকরণসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর মুদ্রানীতি ও ঋণনীতি হতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে উপযুক্ত রাজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবসায় সরকারি, বেসরকারি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়ার বাস্তবায়ন জরুরি। সেইসাথে লেনদেনে ব্যবহৃত কোডসমূহের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি লেনদেনে অটোমেশন চালু জরুরি। জাতীয় পেমেন্ট সিস্টেম অটোমেশন জরুরি।

২৫% ঋণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে বরাদ্দ

৭.২৩ ব্যাংক খাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে সব বিষয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা অতীতে সুপারিশ করেছি সেগুলো খুব একটা বাস্তবায়ন হয়নি বিধায় আসন্ন বাজেটে আবারো অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছি। সেগুলো হল: (ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্তত ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পুঁজিসম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হোক এবং প্রতিটি ব্যাংকে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

সেল" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এ ঋণ হতে হবে চাহিদা-তাড়িত; সরবরাহ-চালিত নয়। (খ) স্থানান্তরযোগ্য সম্পদের ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং সিস্টেমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। (গ) অভ্যাসগত ঋণখেলাপীদের (habitual defaulters) মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মাক পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে তাদের পুর্ণউদ্যমে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা ঠিক হবে না। সমস্যাটি জটিল তবে সমাধান সম্ভব বলে আমরা মনে করি। (ঘ) যুবকদের উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবক হতে উৎসাহিত করতে স্টার্ট আপ পুঁজি সরবরাহ করে প্রকল্প সম্প্রসারিত করতে হবে। আর্থিক খাতের জন্য আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ করা হোক।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার

৭.২৪ জমি-জলা-জঙ্গল ('৩-জ') সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমরা মনে করি যে প্রস্তাবিত বাজেট বছরেই কৃষি ও কৃষক ভাবনার যর্থাথতা বিচারে ১ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ বিঘা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব; আর পাশাপাশি ২০ হাজার জলাহীন প্রকৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ হাজার বিঘা খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব। বিষয়টি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে এ লক্ষ্যে কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দসহ বাস্তবায়ন কৌশল-সংশ্লিষ্ট পথনির্দেশনা প্রদান জরুরি।

দেশে ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা এখন জমিদস্যু-জলাদস্যুদের দখলে। এসব খাস জমি-জলা দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য হিস্যা। তা কিভাবে দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের মালিকানায় যাবে এ বিষয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে। 'বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও কৃষক ভাবনার' নিরিখে–যার মধ্যে অন্যতম ছিল "৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী গণমুখী সমবায় গঠন"–বিষয়টি এবারের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার শিরোনামে যথামাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টন, খাস জমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাস জলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গা চাষীর বর্গা স্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট দিকনির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ থাকতে হবে।

৭.২৫ যদিও বর্তমান সরকারের ২০০৮ নির্বাচনী ইশতেহার 'রূপকল্প ২০২১'-এ 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল–কিন্তু, গত বাজেটে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না। আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের আসন্ন বাজেটে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ স্থির করা প্রয়োজন।

কৃষি ভর্তুকি

৭.২৬ কৃষিখাতের অর্জন ধরে রাখতে নিশ্চিত করা জরুরি যেন কৃষি ভর্তুকি হ্রাস না পায় এবং একই সাথে যেন ভর্তুকি-বৈষম্য হ্রাস পায়।

গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি

৭.২৭ ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (R&D expenditure) ছাড়া প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বৈষম্য হ্রাস ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন। এ লক্ষ্যে আমাদের নির্দিষ্ট সুপারিশ যে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিশেষত কৃষি সংশ্লিষ্ট উপখাতে পৃথক বরাদ্দ দেয়া উচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশলগত কারণে আমরা মনে করি আসন্ন বাজেটে শুধুমাত্র কৃষি খাতের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা।

ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বীমা

৭.২৮ ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য "শস্য বীমা", "কৃষি বীমা", "জীবিকা বীমা", "প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা", "গবাদি পশু বীমা" ইত্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথ নির্দেশসহ ব্যয়-বরাদ্দ আসন্ন বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

চর-হাওর-বাওর, আইলা-সিডর-সাইক্লোন এলাকার দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জন্য সুদ বিহীন ঋণ

৭.২৯ দারিদ্র্য-পীড়িত ভৌগলিক এলাকা (চর-হাওর-বাওর) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ (আইলা-সিডর-সাইক্লোন) এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদবিহীন স্বল্পমেয়াদি (৬মাস) ঋণ প্রদান একইসাথে দারিদ্র দূরীকরণ ও বৈষম্য হ্রাসে অন্যতম পন্থা হিসেবে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আর এ বছর ঘূর্ণীঝড় ফণি-তে গ্রামীণ মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। দরিদ্র-প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ, হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন, এবং ফণির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বিষয়াদি আসন্ন বাজেটে বিবেচিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত। এ তিন উপখাতে আসন্ন বাজেটে আমরা মোট ৫ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করছি।

কৃষি ফসলের উৎপাদন অঞ্চল গঠন, শস্য বহুমুখীকরণ, উপকরণ সংরক্ষণ, বিপনন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো

৭.৩০ বাংলাদেশের কৃষি এখনও প্রকৃতি নির্ভর। যত না বাজারের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশি নিজ প্রয়োজনে কৃষক ফসল উৎপাদন করেন। বাজার মূল্যের চেয়ে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বেশি। ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থাও অপ্রতুল। শুধু ফসলই নয় প্রাণিজ আমিষের বাজার মূল্যও অনিয়ন্ত্রিত। তৈলবীজ ও মশলা জাতীয় শস্য উৎপাদনের সুযোগ ও চাহিদা আছে। কিন্তু সে অনুযায়ী উৎপাদন হয় না। আবার

সব এলাকায় সব ফসল হয় না। এ প্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তাব হল: একটি নির্দিষ্ট সময়ে কৃষি পণ্যের কি পরিমাণ চাহিদা আছে তা নিরুপন করে, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য বাজেটের আওতায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সুবিধাজনক এলাকা ভাগ করে "কৃষি উৎপাদন অঞ্চল" গঠন করা।

৭.৩১ দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন-ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য-বহুমুখীকরণ-এর দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৭.৩২ কৃষি খাতের উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে; মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাসে সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ। প্রতিটি উপজেলাভিত্তিক (প্রয়োজনে বিশেষ গ্রামসহ) কৃষি উপকরণ, পণ্য সংরক্ষণ এবং বিপণনের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড-স্টোরেজ (প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ) নির্মাণকল্পে বিশেষ কর্মসূচিভিত্তিক অবকাঠামোর কথা ভাবা জরুরি।

কৃষককে কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রদান

৭.৩৩ আমাদের দেশের কৃষক তাঁর শ্রমে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য পান না– একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষির বাইরে অন্য কোন কর্মখাত-ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলে কৃষক কৃষি কাজ ছেড়ে দিতেন; করতেন না কৃষিকাজ। আর সে ক্ষেত্রে কৃষি পণ্য উৎপাদন নিঃসন্দেহে হ্রাস পেত। ফলশ্রুতিতে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসর্ম্পূণতা ব্যাহত হতো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান হ্রাসের ফলে মোট দেশজ প্রবৃদ্ধি কমে যেতো এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নিয়ে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা এ রকম: এবছর যে বোরো ধান বাজারে এসেছে তাতে মণ প্রতি কৃষকের উৎপাদন খরচ (বিভিন্ন স্থান ও জাতভেদে) ৯০০-১০০০ টাকা। কিন্তু কৃষককে বাজারে তা বিক্রি করতে হচ্ছে (বিভিন্ন স্থান ও জাতভেদে) ৬০০-৭০০ টাকায়, অর্থাৎ কৃষকের মণপ্রতি লোকসান ২০০-৪০০ টাকা। বোরো ধান চাষে কৃষকের লোকসানের এ হিসেব প্রকৃত লোকসানের তুলনায় অনেক কম। আসলে উৎপাদন ব্যয়/খরচে কৃষকের পারিবারিক শ্রমের অংশ হিসেবপত্তর করলে (এটা "মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত হয় না"–এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের পর্বতসম ব্যর্থতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ) এ বছর বোরো ধানে কৃষকের প্রকৃত লোকসান হবে কমপক্ষে ৫০০ টাকা। এ নিয়ে সরকারের চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা মনে করি কৃষককে তাঁর উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজারমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য জরুরিভাবে কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে: (১) সরকারিভাবে সংগ্রহের ক্রয়মূল্য শুধু উৎপাদন খরচের তুলনায় কমপক্ষে ২০ শতাংশ বাড়ালেই হবে না (অর্থাৎ সেক্ষেত্রে এ বছরের বোরো ধানের মণপ্রতি বিক্রয়মূল্য হতে হবে কমপক্ষে ১২০০ টাকা) সেইসাথে নিশ্চিত করতে হবে প্রকৃত কৃষকই (মধ্যস্বত্বভোগী-দালাল নয়) যেন কোন ঝামেলা ছাড়াই ঐ বাজার

মূল্য পান। সরকারিভাবে সংগ্রহের কাজটি সরকারি উদ্যোগেই বিভিন্ন হাট-বাজার-মোকামে সংগঠিত করতে হবে; (২) কৃষি পণ্য উৎপাদনের আগেই কৃষক যখন থেকে জমি প্রস্তুত শুরু করবেন তখন থেকেই তাঁকে স্বল্প সুদে অথবা পারলে বিনা সুদে (অন্তত দরিদ্র, প্রান্তিক, ক্ষুদে কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার কৃষকদের) স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিতে হবে যেন তিনি চড়া সুদের ঋণের জালে আবদ্ধ না হন অথবা কৃষি কাজে লোকসানের কারণে সম্পদহীন হয়ে না পড়েন; (৩) কোন কারণে কৃষি ফসল মার গেলে মূল ঋণ (সুদ তো বটেই যদি থাকে) মওকুফ হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও কৃষক ভাবনার মূল চেতনার নিরিখে কৃষককে কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য প্রদানের এ বিষয়টি আসন্ন বাজেটে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেই হবে। এবং সে অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে আমরা ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ

৭.৩৪ কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিশেষত: তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে বাজেটে আর্থিক নিদের্শনা থাকা জরুরি।

দারিদ্র্যের ধরণ ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার

৭.৩৫ এবারের বাজেটে সম্ভবত গতবারের ন্যায় অতি দরিদ্র বা হত দরিদ্রদের তালিকা প্রণয়নের কথা বলা হবে। মনে রাখা জরুরি যে, দারিদ্র্য হার হ্রাস নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই, কারণ দারিদ্র্য বহুমুখী। বহুমুখী দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন ধরণের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রস্তাবিত এই "দারিদ্র্যের তথ্য ভান্ডারে" দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরণ ভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম ঠিকানাসহ অর্ন্তভুক্ত হতে হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারী প্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, ভৌগলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি। দারিদ্র্যের এ ধরণের তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে বরাদ্দসহ বাস্তবায়নের সময়-নির্দিষ্ট দিক নিদের্শনা থাকা জরুরি বলে আমরা মনে করি। বিষয়টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-SDG অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবর্ধমান মানব বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণ

৭.৩৬ এদেশে ক্রমবর্ধমান মানব বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা ও বহুমুখী দারিদ্র্য নিরসনে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জরুরি ভিত্তিতে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন: (ক) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কিভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সকল ধরণের বৈষম্য হ্রাসে অবদান

রাখবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা; (খ) দারিদ্র্য নিরসন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কার্যকরী পদক্ষেপ; (গ) দেশে প্রতিবছর ৩০ লাখ মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে কিন্তু তার মধ্যে ২০ লাখ মানুষেরই কর্মসংস্থান হয় না। এসব বেকারের আত্মকর্মসংস্থানসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি। সেই সাথে ক্রমবর্ধমান যুব বেকারদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কর্মসংস্থানের কর্মসূচি; (ঘ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদ রক্ষা ও শ্রম-ভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা; (ঙ) ভূমিহীন কৃষক, কর্মচ্যুত শ্রমিক, বাস্তুচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারী-প্রধান খানা (যার অধিকাংশই দরিদ্র), বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (এখন প্রায় ৮০ লাখ মানুষ), বস্তিবাসী, চরের মানুষ, ক্ষুদ্রজাতিসত্বার আদিবাসী মানুষ (আনুমানিক ৫০ লাখ), নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের (৪০-৫০ লাখ) মানুষসহ সকল প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রস্তাবনা।

সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী

৭.৩৭ এদেশে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী সুবিধা পাবার যোগ্য খানার (household) সংখ্যা ২ কোটি যাদের ৭৫ শতাংশ এ সুবিধাবঞ্চিত। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) বাজেট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় ৩ গুণ বৃদ্ধি জরুরি। সেইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধাপ্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সাথে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন যেন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর "অর্ন্তভুক্তি ভ্রান্তি" (inclusion error) দূর করা যায়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে আসন্ন বাজেটে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা জরুরি।

৭.৩৮ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় "প্রবীণ নীড়" গড়ে তোলা সময়ের দাবি। দেশে একদিকে যেমন মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ছে তেমনি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার (extended family) ভেঙ্গে অনু-পরিবার (nuclear family) বাড়ছে আর ফলশ্রুতিতে অনেক প্রবীণ মানুষদের বিশেষত দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের আশ্রয়হীন হবার সম্ভাবনা বাড়ছে। আমরা মনে করি প্রবীণ মানুষদের জন্য "প্রবীণ নীড়" ("বৃদ্ধাশ্রম" নয়) গড়ে তোলার বিষয়টি বাজেটে থাকা জরুরি।

৭.৩৯ পেনশনভোগিদের পেনশনপ্রাপ্তির আয় থেকে এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পেনশনের অর্থ বিনিয়োগের আয় থেকে সব ধরণের আয়কর, কর, শুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করা উচিত।

৭.৪০ আমরা যেহেতু উন্নয়নে অগ্রগামী সেহেতু এখন থেকেই সার্বজনীন পেনশন প্রদানের বিষয় নিয়ে ভাবনা জরুরি। বিষয়টি আসন্ন বাজেটে অর্ন্তভুক্তির জন্য আমরা সুপারিশ করছি।

অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ

৭.৪১ অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং সুষম উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি। আমরা মনে করি আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, দলিত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষদের প্রতি বাজেট বরাদ্দ দেশের মূল স্রোতের মানুষদের তুলনায় মাথাপিছু কমপক্ষে ২-৩ গুণ বৃদ্ধি করা উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারার অধিকহারে বৈষম্য রোধ

৭.৪২ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। একদিকে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগত অধিকহারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি আর অন্যদিকে বহুধারার শিক্ষাব্যবস্থাসহ ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যয় প্রকৃত অর্থেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানালোকিত করে না। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষাব্যবস্থাকে এরকম দুর্যোগের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে একুশ শতকের বিশ্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখানো এক ভ্রান্ত ধারণা বলে আমরা মনে করি। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত করে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞান এখন সমার্থক নয়; শিক্ষা এখন "বিদ্যাবস্তু"। শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য সমাজ জীবনকে প্রগতি বিমুখ করছে। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ পরবর্তী বিগত ৪৩ বছরে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এখন বাংলাদেশে প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন ছাত্র মাদ্রাসাগামী— এটা শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ ফল। এধরণের অবৈজ্ঞানিক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য পুনরুৎপাদন করছে অন্যদিকে তা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট করছে। প্রবণতাটি মারাত্মক। আমরা আশা করছি আসন্ন বাজেটে শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট উত্থাপিত বাস্তব বিষয়াদি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণসহ সমাধান-উদ্দিষ্ট পথ নির্দেশনা থাকবে। একই সাথে আমাদের সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা হ'ল "শিক্ষা ও প্রযুক্তি" খাতে "কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ" নামে যে উপখাত আছে তা 'কারিগরি শিক্ষা বিভাগ' এবং "মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ" নামে আলাদা করা দরকার। এবং সেই অনুযায়ী আসন্ন বাজেটে বরাদ্দ দেখানো দরকার (ভিন্নভাবে 'পরিচালন' ও 'উন্নয়ন' বরাদ্দ)। এ

ক্ষেত্রে আমরা আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে কারিগরি শিক্ষা বিভাগের জন্য ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি (সারণি-২ দেখুন)।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ

৭.৪৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন ২০১৬ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেইসাথে শিক্ষার স্তর ভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল ইত্যাদি, এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্নভাবে দেখানো উচিত। এ বরাদ্দের আন্তখাত অনুপাত নির্দ্ধারণে মূল ধারার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যৌক্তিক করা হোক। তথ্য-যোগাযোগ-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই শুরু করা যৌক্তিক।

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির কমপক্ষে ৫%

৭.৪৪ গত বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দ ছিল জিডিপি-র মাত্র ১.৯ শতাংশের সমপরিমাণ। আরো দুঃসংবাদ হলো–জিডিপি-র অনুপাতে শিক্ষা খাতের বরাদ্দে নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা যখন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়ে নিকট ভবিষ্যতে উন্নত দেশের তালিকায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি তখন মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাখাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ করতেই হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও পরিচালন মিলে) পর্যায়ক্রমে জিডিপি-র ৮ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। আর তাই আমরা আসন্ন বাজেটে শিক্ষাখাতে (আসলে সরকারি বাজেটে খাতটির নামকরণ "শিক্ষা ও প্রযুক্তি") বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে চারগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি (দেখুন সারণি ২)।

শিক্ষা বাজেটে গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে চিন্তা করতে হবে

৭.৪৫ **শিক্ষা-উৎপাদনশীলতা-উন্নয়ন :** আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি– এ যাবৎ মূলত পুঁজি পুঞ্জিভূতকরণ (capital accumulation) এবং শ্রমিক উপকরণের সম্প্রসারণ ও গুনগত পরিবর্তনের দ্বারা সাধিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, আমাদের Sustainable Development Goal এর কৌশল ও নীতির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, মানবসম্পদের উন্নয়ন ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এজন্য, বহুমূখী পদক্ষেপ নিতে হবে:

(ক) সরকার গৃহীত "জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসত্ত্ব নীতি-২০১৮"এর আশু বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত "রোড ম্যাপ" প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।

(খ) প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণার জন্য, সায়েন্স এবং ইনভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রদান।

(গ) R&D এবং Innovation-র উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে, নতুন প্রযুক্তির যথাযথভাবে ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে মানব সম্পদ উন্নয়ন তরান্বিত করতে হবে। এজন্য শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

(ঘ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে অধিকতর বিবেচনায় নিয়ে, অতি জরুরিভিত্তিতে শিক্ষানীতি সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এ বিপ্লবে, বাংলাদেশের কার্যকর অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪৬ শিক্ষা বাজেটে অন্যান্য গতানুগতিক বরাদ্দের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার মাঠ, সাঁতার শেখার পুকুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুপুরের খাবার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তি ঘর ইত্যাদি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মানের অবক্ষয় রোধ

৭.৪৭ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি এবং মানের অবক্ষয় রোধের লক্ষ্যে আসন্ন বাজেটে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করছি : (ক) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রগতিমুখী সংস্কারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একীভূত করার কর্মসূচি গ্রহণ; (খ) ক্যাডেট কলেজ ও পাবলিক স্কুল পরিচালনায় প্রদত্ত সরকারি ভর্তুকি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার এবং পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষা ধারাকে মূল ধারার সাথে একীভূত করা; (গ) নোট বই মুদ্রণ, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা এবং শাস্তির বিধান চালু করা; (ঘ) প্রাইভেট সেক্টরের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; এবং (ঙ) কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করা।

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমূখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধি

৭.৪৮ সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারীর জন্য কর্মমূখী বৃত্তিমূলক শিক্ষায় গতি বৃদ্ধিতে জাতীয় বাজেটে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এ সবের পাশাপাশি বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের স্কুলমূখী করার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি হবে যৌক্তিক ।

৭.৪৯ **প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা :** মধ্য আয় এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বর্তমান সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিদেশ

নির্ভর। অহেতুক বিদেশ ভ্রমণ ও প্রমোদের পরিবর্তে দেশেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাংলাদেশেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। সাধারণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয় একই ছাতার নীচে প্রশিক্ষিত হতে পারে। বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ কাজের জন্য বিভাগীয় প্রশিক্ষণে স্থানীয় ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের ব্যবহার স্থানীয় পর্যায়ে নেয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

৭.৫০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২,০০০-৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন; ভৌগলিকভাবে পিছিয়েপড়া ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘুর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার মোট ছাত্রসংখ্যার ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ-এ উন্নীত করা এবং অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীনকরণের পদক্ষেপ এ বছরের বাজেটে থাকতে হবে।

বাংলা ভাষায় জ্ঞান চর্চা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়

৭.৫১ একজন মানুষ যে 'ভাষায়' ভাবনা-চিন্তা করেন, যে ভাষায় স্বপ্ন দেখেন, যে ভাষায় দৈনন্দিন একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেন ঐ ভাষার সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রগতি, চিন্তাজগতের বিকাশ কোনটিই সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ভাষাটি 'বাংলা'। সুতরাং শিক্ষার সকল স্তরে বাংলাভাষাকে জ্ঞান-চর্চার মূল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষা কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা অন্য কোনো ভাষা শিখবো না। অবশ্যই শিখবো এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে দু'টি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বলা প্রয়োজন যে পৃথিবীতে একটি দেশও পাওয়া যাবে না যে দেশটি কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নতি করেছে নিজের মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ভিন্ন ভাষায় জ্ঞান চর্চা করে। বিষয়টি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে নীতিগত বিষয়। বিষয়টি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি এবং সে ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর জন্মশর্তবর্ষের আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে যে সব উপখাত-ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ থাকা কাম্য তা হল: জাতীয় অনুবাদ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা (যার প্রধান কাজ হবে বাংলা ভাষার বিশাল জ্ঞানভান্ডারকে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ এবং বিদেশী ভাষার জ্ঞান ভান্ডারকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ এবং এসব জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া), বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন (যার প্রধান কাজ হবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ; তবে বাংলা একাডেমি থাকবে), ব্যাপক হারে গণ-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তৃতি, সারাদেশে শিশুদের মন-মনন-স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য বড় ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রকাশনাকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও সংশ্লিষ্ট প্রণোদন দেয়া, ছাপার কাগজের একচেটিয়া ব্যবসার খপ্পর থেকে

প্রকাশকদের মুক্তি দেয়া, লেখক চিকিৎসা তহবিল গঠন করা, সরকারি অর্থায়নে বই ক্রয় বৃদ্ধি এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

নারী উন্নয়ন ও নারী-উন্নয়ন উদ্দিষ্ট কর্মসূচি

৭.৫২ আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কিন্তু, এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তেমন কোন মৌলিক ও স্থায়ী পরিবর্তন এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় না। নারীর উন্নয়ন না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন হবে না। জাতীয় উন্নয়ন বাজেটে নারীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়াদি সুস্পষ্ট উল্লেখপূর্বক নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় একীভূত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ জাতীয় বাজেটে থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এই প্রয়াসে দরিদ্র নারী ও শিশুর মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য জাতীয় বাজেটে তা অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। চাহিদাসমূহ হলো অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ইত্যাদি। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট-সহজবোধ্য বড় মাপের বরাদ্দসহ সময়-নির্দিষ্ট পথ নিদের্শনা থাকতে হবে। একই সাথে "নারী উন্নয়ননীতি ২০১১" বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট ও সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি।

৭.৫৩ নারী-উদ্দিষ্ট (gender sensitive) কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তা সবিস্তার উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নারীদের কর্মসংস্থান, কর্মজীবী নারীদের আবাসন (গার্মেন্টসসহ), নারীদের পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রয়ণ, বিধবা ভাতা, দুঃস্থ নারী ভাতা, শিক্ষকদের ৬০% নারী, নারীর নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধা, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা, ইত্যাদি।

৭.৫৪ মজুরি বৈষম্য দূর করে সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা, ন্যূনতম মজুরি আইন বাস্তবায়ন, চুক্তিপত্র, মজুরি, পদোন্নতি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকারের মনিটরিং পদ্ধতি চালু, পছন্দমত পেশা নির্বাচনের অধিকার নিশ্চিত করা, সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন, অর্জিত আয় এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, জিডিপি-তে গৃহস্থালি ও সেবামূলক কর্মকান্ডের স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত অর্থে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে সার্বিক সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। এসব বিষয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণনীতির পরিবর্তন

৭.৫৫ সকল শ্রেণির নারী উদ্যোক্তাদের অধিকার উৎসাহিত করার জন্য ঋণনীতির পরিবর্তন করতে হবে। একই সঙ্গে স্বল্প সুদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিনা সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.৫৬ ক্ষুদ্র ঋণের (micro credit) ফাঁদ থেকে দরিদ্র নারীদের মুক্তি দিতে সরকারীভাবে ক্ষুদ্র-অনুদান (micro-grant)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণসহ স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণ

৭.৫৭ নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে গতানুগতিকতার বিপরীতে এবারের বাজেটে নারীর জন্য বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে বরাদ্দ কয়েকগুণ বাড়াতে হবে।

৭.৫৮ জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাজেটে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচির বরাদ্দ স্পষ্টীকরণ

৭.৫৯ বাজেটে নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে: অশনাক্ত নারী যক্ষ্মা রোগীর সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় বরাদ্দ (গত বাজেটের তুলনায়) ২ গুণ বাড়াতে হবে; ১০০ ভাগ নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৪গুণ বাড়াতে হবে; ক্রীড়া খাতে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ ৪ গুণ বাড়াতে হবে; মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় বরাদ্দ (যে খাতে আলাদা বরাদ্দ নেই) ৩ গুণ বাড়াতে হবে; নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩০ গুণ বাড়াতে হবে।

স্বাস্থ্য খাতে প্রাথমিকসহ দ্বিতীয় স্তরের উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা বিধান

৭.৬০ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যখন উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সাথে তুলনা করছে তখন আমাদের দেশে এ খাত উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার সর্বনাশা প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হচ্ছে—রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা রাষ্ট্রের সহায়তায়। সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকে আশ্রয় নিচ্ছেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প বরাদ্দ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচারণ ও জরাজীর্ণতার প্রতীক হয়ে আছে যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের সামিল। পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে

রোগীর নিজস্ব অর্থ ব্যয় (out of pocket expenses) অনেক বেশী (প্রায় ৬৪%, আর সরকার বহন করে ২৪%)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল অসংক্রামক রোগের বিস্তৃতি ও চিকিৎসায় ব্যক্তিগত ব্যয়ের উচ্চ হারের কারণে আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। এ অবস্থায় একবিংশ শতকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এখন শুধুমাত্র প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার কথা বললে হবে না, বলতে হবে দ্বিতীয় স্তরের উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবার কথা। আসন্ন বাজেটে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা খাতের অগ্রাধিকার এবং বেসরকারি-প্রাইভেট স্বাস্থ্য খাতের যৌক্তিক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বসহ বিবেচনা করে সুর্নিদিষ্ট পথ নির্দেশনা আমরা আশা করছি।

স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচনা

৭.৬১ স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ কমপক্ষে ৪ গুণ বৃদ্ধি করা হোক। উল্লেখ্য যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে যখন স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় ১২ ডলার হওয়া উচিত তখন তা আমাদের দেশে মাত্র ৩ ডলার। আরো উল্লেখ জরুরি যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে যে একটি মানসম্মত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপি-র ৫ শতাংশ সেখানে গত বছরে আমাদের বরাদ্দ ছিল জিডিপি-র মাত্র ০.৯২ শতাংশ-এর সমপরিমাণ (অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের চেয়ে ৫ গুণ কম)। মনে রাখা জরুরি যেখানে আমরা স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় প্রবেশ করছি সেখানে মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে।

"দারিদ্র্যের রোগ" নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ-প্রাধান্য দেয়া

৭.৬২ স্বাস্থ্য খাতে "দারিদ্র্যের রোগ" (diseases of poverty) নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ-প্রাধান্য দেয়া হোক। এসব রোগের অন্তর্ভুক্ত যক্ষা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া, হাম, এবং আর্সেনিকোসিস। বিষয়টি ভবিষ্যত জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, অনতিবিলম্বে দারিদ্র্যের রোগ হ্রাস করতে না পারলে ভবিষ্যত সরকার ও পরিবার উভয়েই স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে। ফলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হবে আর মধ্যবিত্ত মানুষের বিত্তের অধোগতি হতে বাধ্য। এসবের ফলে সমাজে বৈষম্যও বাড়বে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের বাজেটে এসব আদৌ কাম্য নয়, যা কাম্য তা হল "মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি", "মানুষের সুস্থ দীর্ঘায়ু" যার অন্যতম প্রধান বাহন হল স্বাস্থ্য–সুস্বাস্থ্য।

মাতৃমৃত্যু হ্রাস করা

৭.৬৩ মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যু সংখ্যা ১৯৯০ সালের ৫৭৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১৪৩-এ (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে/প্রসবে) নামিয়ে আনার কথা। সংশ্লিষ্ট এ খাতে সর্বশেষ বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৮৬ কোটি টাকা। কিন্তু মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নসহ মাতৃমৃত্যু কাঙ্খিত মাত্রায় কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন বছরে কমপক্ষে আনুমানিক ১ হাজার কোটি টাকা। সেজন্য আমাদের প্রস্তাব এ-খাতে এখনকার তুলনায় তিনগুণ বেশি বরাদ্দ দেয়া হোক।

মাতৃদুগ্ধের কোন বিকল্প নেই

৭.৬৪ শিশুদের জীবন সমৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোনই বিকল্প নেই। যে কারণে একদিকে যেমন নবজাতক শিশুদের জন্য "শুধুমাত্র মায়ের দুধ" (exclusive breast feeding) নিশ্চিত করার জন্য সব ধরণের পদক্ষেপ নিতে হবে, তেমনি অন্যদিকে মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে যে সব গুড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয় আমরা তা নিষিদ্ধ করার পক্ষে–প্রাকৃতিক কারণেই। মায়ের দুধের কোনই বিকল্প থাকতে পারে না এবং মায়ের দুধ (শাল দুধসহ) একজন নবজাতক শিশুকে প্রায় সকল ধরণের রোগ-ব্যধি থেকে মুক্ত রাখার প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করে। এ কথা সরকারিভাবে স্বীকার করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজেট খাতে তা প্রতিফলিত হতে হবে।

শিশুর অকাল মৃত্যুরোধ

৭.৬৫ আমাদের দেশে শিশুর জন্মের প্রথমদিন, জন্মের ৭ দিনের মধ্যে এবং জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যু হার অত্যুচ্চ। অথচ এই অতি-অকাল মৃত্যুরোধ শুধু সম্ভব তাই নয় স্বল্প ব্যয়েই সম্ভব। আর শিশুদের এ অতি-অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারলে ঐ শিশু সুস্থ-দীর্ঘজীবন পাবে। আমরা মনে করি স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট এ উপখাতে কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। বরাদ্দের গন্তব্যস্থল হতে হবে প্রধানত জেলা শহরের হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল, ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতাল এবং কমিউনিটিক্লিনিক।

নবজাতক শিশুর স্ক্রীনিং সেবা

৭.৬৬ নবজাতক শিশুদের অনেকেই হাইপোথাইরয়েডইজম-এ আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পঙ্গুত্ব বরণ করে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অথচ নিউবর্ন স্ক্রীনিং সেবা একদিকে যেমন সাশ্রয়ী তেমনি অন্যদিকে এ সেবা (পরীক্ষা) প্রদানে তেমন প্রশিক্ষিত কর্মীরও প্রয়োজন নেই। স্বাস্থ্য-পরিবার পরিকল্পনা খাতে কর্মরত মাঠ কর্মীরাই এ সেবা প্রদানে সক্ষম। আমরা মনে করি নবজাতক শিশুর থাইরয়েড স্ক্রীনিং খাতে এবছর প্রাথমিকভাবে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

পুষ্টি

৭.৬৭ এতদিন ধরে মোট খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ-এর উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং তদনুযায়ী মোট ক্যালরি হিসেব করা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে দরিদ্র-অদরিদ্র পরিমাপ করা হয়েছে (যেমন একজন ব্যক্তি যদি প্রত্যেক দিন ২১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করেন তিনি হবেন দরিদ্র, অন্যথায় অদরিদ্র)। এসব হিসেবে পুষ্টিগুণের বিচার নেই। খাদ্য গ্রহণের এসব হিসেবপত্তর বিজ্ঞান সম্মত নয়। খাদ্য গ্রহণের নিরিখে একজন ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা নিরুপন করতে হবে পুষ্টি দিয়ে। বিষয়টি বাজেটে প্রতিফলিত হতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে ব্যয় বরাদ্দ দিতে হবে। পুষ্টি বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে দরিদ্র-বঞ্চিত-অবহেলিত মা, বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে (গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী–উভয় সময়েই) এবং দুর্যোগকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ সবার ক্ষেত্রে। এছাড়াও শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য বিষয়টি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতে যথেষ্ট পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপদ-ভেজালমুক্ত খাদ্য

৭.৬৮ ভেজালহীন, নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারিভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়া, জোরদার করা এবং তা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, দীর্ঘদিন বিষাক্ত-ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে গর্ভবতী মা ও তার গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতি হয়, সন্তানও ক্যান্সার-কিডনি-লিভারসহ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, জন্ম হয় বিকলাঙ্গ শিশু, গর্ভস্থ শিশুর স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী হবার সম্ভাবনা বাড়ে–এসব ঝুঁকি হতে পারে ভয়াবহ ও বংশপরম্পরা। গবেষণা এও বলছে যে খাদ্য বিষমুক্ত-ভেজালমুক্ত করা গেলে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানো সম্ভব। ভেজাল খাদ্য, অনিরাপদ খাদ্য ও গুণ-মানহীন খাদ্য একদিকে যেমন বহুধরণের অসুখ-বিসুখের প্রধান কারণ তেমনি তা ক্রমবর্দ্ধমান আয়ুষ্কালে অসুস্থ-জীবন ও সমৃদ্ধিহীন দীর্ঘায়ুরও প্রধান কারণ। বিষয়টি বাজেটে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

৭.৬৯ সুপেয় পানি (খাওয়ার) ও স্যানিটেশন (স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনসহ) জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। এ দুই উপখাতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ খাতের বরাদ্দ চলতি বছরের তুলনায় অনেক বাড়াতে হবে। এ দুই উপখাতের জন্য বাজেটে ভিন্ন লাইন-আইটেম থাকা জরুরি।

৭.৭০ বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে: বাংলাদেশের খাবার পানির অর্ধেক (৫০%) আর্সেনিক অথবা ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়াযুক্ত। ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং অত্যন্ত বড় মাপের জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু, সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহের কর্মসূচি এপর্যন্ত তেমন গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে সনোফিল্টারের সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বাজেটে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭.৭১ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খাওয়ার পানির লবণাক্ততা সমস্যা সমাধান না করতে পারলে এসব অঞ্চলের মানুষদের সুস্বাস্থ্য ও জীবন–সমৃদ্ধি কোন দিনই উন্নত হবে না। এ সমস্যা সমাধানে বাজেটে সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত

৭.৭২ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার প্রকৃত মাত্রা ও তার অভিঘাত সম্পর্কে আমরা যা জানি প্রকৃত অবস্থা তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় অসহনীয়। এদেশে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার অনেক হলেও এসবের প্রকৃত মাত্রা ও অভিঘাত সম্পর্কে আমরা খুবই কম জানি। তবে এ কথা আমরা নিশ্চিত জানি যে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ তেমন নেই বললেই চলে। আর পাশাপাশি এসবে সমন্বয়হীনতার মাত্রা অপরিসীম। আমাদের প্রস্তাব এ-বারের বাজেটে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা করা হোক। একই সাথে ঐ বরাদ্দ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেয়া হোক কার্যকর সমন্বয়ের পথ নির্দেশনা।

প্রতিবন্ধীদের জন্য সুনির্দিষ্ট খাতে বাজেট বরাদ্দ

৭.৭৩ "কাউকে পিছনে রাখা যাবে না"–এটাই আমাদের অন্যতম উন্নয়ন স্লোগান (এ স্লোগান SDG-র ও)। বাংলাদেশে কমপক্ষে ১০ শতাংশ মানুষ ১১ ধরণের প্রতিবন্ধীতার শিকার অথবা "আদারওয়াইজ এ্যবল"। এসব মানুষ নিয়ে কার্যকর ভাবনা নেই বললেই চলে। যেমন ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ বঞ্চিত। এসব প্রতিবন্ধী মানুষদের ব্যাপক অংশ আনুপাতিক বেশি হারে দরিদ্র-স্বল্পবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। আমাদের দেশের বাজেটে 'আদারওয়াইজ এ্যবল' জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য আলাদা ভাবে কোন বরাদ্দ নেই। এ নিয়ে আমরা বিগত দশ-পনেরো বছর যাবৎ উচ্চকণ্ঠে বলে আসছি। খুব একটা কাজ হয়নি। "আদারওয়াইজ এ্যবল" বা প্রতিবন্ধী এসব মানুষদের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, আবাসন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে নির্দিষ্ট উপখাতভিত্তিক কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হোক এবং ঐ

বরাদ্দের ফল উদ্দিষ্ট মানুষেরা কিভাবে পাবেন সে বিষয়ে বাজেটে পথ-নির্দেশনা থাকা উচিত যদি "কাউকে পেছনে রাখা যাবে না"–এ বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস সত্য হয়। উল্লেখ্য যে, আমাদের হিসেবে "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তার মধ্যে মাত্র ১.৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী-উদ্দিষ্ট। এ বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অতি নগন্য। যে কারণে এ খাতে আমাদের প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের (৮০ হাজার ২৫০ কোটি টাকার) মধ্যে কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা (২.৫%) আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দের সুপারিশ করছি। আমাদের স্পষ্ট সুপারিশ হলো, এ বরাদ্দ থেকে উপকারভোগীর সংখ্যা এখনকার ৮০-৯০ হাজার মানুষ থেকে ৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা। এ বরাদ্দ থেকে প্রতিবন্ধী মানুষ যেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবাসন ও কর্মসংস্থানের (যেমন 'আত্মকর্মসংস্থান তহবিল' হিসেব ৪০০ কোটি টাকা) সুযোগ পান, তেমনি পান অবকাঠামো ও তথ্যের প্রবেশাভিগম্যতা (৫০০ কোটি টাকা), অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা মাথাপিছু ভাতা, তৃণমূল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের জন্য কমপক্ষে ৩০০ কোটি টাকার বরাদ্দ ইত্যাদি। প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য প্রস্তাবিত এসব বরাদ্দের ফল উদ্দিষ্ট মানুষেরা কিভাবে সহজেই পাবেন সে বিষয়ে পথ-নির্দেশনা আমাদের মানবিক-নৈতিক দাবি।

নদী দখল ও দূষণ প্রতিকার

৭.৭৪ বিগত তিন অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার পায়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। পরিবেশ বান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠির পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কর্মকান্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

৭.৭৫ নদ-নদীসহ বিভিন্ন জলাশয় অবৈধ দখল মুক্ত করতে সরকারের 'শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি প্রশংসার দাবি রাখে। এ নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে বাজেটে সমন্বিত উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট কর্ম-কৌশল থাকতে হবে।

৭.৭৬ পরিবেশ দূষণকারীদের জন্য বিশেষ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে "যে যতটুকু পরিবেশ দূষণ করে সে ততটুকু দূষণ-রোধ কর প্রদানে বাধ্য থাকবে"–নীতিটি (polluters pay principle) বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ নীতি একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশ দূষণ কমবে এবং কমবে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যহানি। 'সবুজ উন্নয়ন'-এর ক্ষেত্রে এটা হতে পারে অন্যতম বাহন।

৭.৭৭ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে (waste management) বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তরল ও কঠিন/শক্ত বর্জ (liquid and solid waste) –উভয় বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। এ সব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেটে একথা স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে যে বর্জ্য যেন 'Regenerated' হয় অর্থাৎ বর্জ্য যেন বর্জ্য থেকে স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হয়। বিষয়টি আধুনিক প্রযুক্তিগত। এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি ঘটবে, পরিবেশ রক্ষা পাবে এবং একই সাথে বিকশিত হবে 'সবুজ অর্থনীতি'।

নদীর নাব্যতা ও "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা"

৭.৭৮ নদীর নাব্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, নৌপথে মালামাল ও যাত্রী পরিবহন উভয়ই যথেষ্ট সাশ্রয়ী ও নিরাপদ।

৭.৭৯ বর্তমান সরকারের গৃহীত শতবর্ষমেয়াদী "বদ্বীপ-পরিকল্পনা" অত্যন্ত সুদূর চিন্তা-প্রসারী, বাস্তবসম্মত এবং জরুরি কর্মকান্ড। এ বিষয়ে, সরকার প্রশংসার দাবিদার। এ নীতি বাস্তবায়নে, বাস্তবসম্মত কর্ম-কৌশলের মাধ্যমে প্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন দৃশ্যমান করা দরকার।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়ন

৭.৮০ বিগত তিনটি বাজেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন, দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। এ বছর ঘূর্ণিঝড় ফণি-তে ফসলের যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। এজন্য বাজেটে থোক বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। আমরা এসমস্ত কর্মসূচির অগ্রগতি জানানোসহ ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করছি।

রেমিটেন্স প্রবাহকে ফলপ্রদ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহার

৭.৮১ প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স-এর পরিমাণ এখন (২০১৮ সালে) ১ লক্ষ ৩০ হাজার ২৯৩ কোটি টাকার সমপরিমাণ (যা চলতি মূল্যে জিডিপি'র ৫.৮২%, আর আমাদের প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের ১০.৫%-এর সমপরিমাণ)। এ অর্থের ফলপ্রদ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ পদ্ধতি বের করা জরুরি। উপজেলা কুটির শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে শিল্প বাণিজ্য প্রক্রিয়া চালু করে এ অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব। এ অর্থ বিশেষ বন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রবাহিত হতে পারে। এসব দিক নির্দেশনা বাজেটে থাকা জরুরি।

প্রবাসে কর্মীদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্তকরণ

৭.৮২ প্রবাসে কর্মরতদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রবাসে অর্জিত অর্থ বৈধ পথে দেশে পাঠানোর জন্য সম্ভাব্য সবধরণের পদক্ষেপ সম্পর্কে বাজেটে নির্দেশনা থাকতে হবে। অবৈধ পথে প্রেরিত অর্থ শুধুমাত্র উন্নয়ন গতিকেই হ্রাস করে না তা বিভিন্ন ধরণের অনাকাঙ্খিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি করে।

শিল্পায়ন

৭.৮৩ শিল্পনীতির সংস্কার

রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি ২০১৫-৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে বিবেচনায় রেখে শিল্পনীতি ঢেলে সাজিয়ে তা দেশজ-বৈদেশিক বিনিয়োগ-বান্ধব ও টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণ-বান্ধব করতে হবে।

আমদানীমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল

৭.৮৪ মুক্তবাজার ও অসম বিশ্বায়নের তোড়ে জাতীয় অর্থনীতি রক্ষার জন্য আমদানীমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হোক। রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল আরো কিভাবে জোরদার করা যায় সে বিষয়ে আসন্ন বাজেটে নির্দেশনা থাকবে বলে আমরা আশা করি।

শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নে বিদ্যুৎখাতের অবকাঠামো নির্মাণ

৭.৮৫ শিল্পায়নসহ অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎখাতের অবকাঠামো নির্মাণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম (তবে এক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যা আছে), তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অতি ব্যয় সাপেক্ষ এবং গ্যাস ভিত্তিক অনেক কম। যেহেতু গ্যাসের মজুত কম, কয়লা ভিত্তিক বড় আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী হবে (তবে পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাবসহ)। পরিবেশগত বিবেচনায় রিনিউএবেল এনার্জি সবচেয়ে কাম্য। সরকার এ দিকে নজর দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আমাদের দেশে দুর্বল। ঘুর্ণিঝড় দুর্ঘটনাপ্রবণ বাংলাদেশে সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এ ক্ষেত্রে খরচ সাপেক্ষ হলেও জিআইএস সিস্টেম ভিত্তিক সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দীর্ঘ মেয়াদে সুফল বয়ে আনবে। সঞ্চালন ব্যবস্থা শক্তিশালী ও টেকসই করার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনকার তুলনায় ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রীড লাইনের উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগে অগ্রাধিকার

জরুরি। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার আর্থিক ও কারিগরি প্রক্ষেপণ এবং অডিট প্রচলন অতীব জরুরি। একদিকে গ্রীড বিপর্যয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং অন্যদিকে অর্থনীতির উপর এর প্রভাব নির্ণয় করা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

তেল-গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

৭.৮৬ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠনের হাল অবস্থা বাজেটের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা

৭.৮৭ স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়েপড়া এলাকাগুলোতে "অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এ পদক্ষেপ দেশে সামাজিক ও ভৌগলিক– আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হবে।

শিল্প পার্ক স্থাপন

৭.৮৮ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; বিশেষ করে শিল্প পার্ক গড়ে তোলা দরকার। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।

শিল্প অর্থায়নে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক শক্তিশালীকরণ

৭.৮৯ দেশে শিল্প অর্থায়নের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি বাজেট বরাদ্দ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করা জরুরি। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জালে বন্দী হয়ে খেলাপী ঋণ বৃদ্ধি করছে। ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন; ব্যাংকিং কমিশন গঠন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে ভাবনা জরুরি।

বিনিয়োগ বোর্ডের সংস্কার

৭.৯০ বিনিয়োগ বোর্ডের বর্তমান কাঠামো দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণে তেমন সক্ষম হচ্ছে না। বর্তমান বিনিয়োগ বোর্ড মধ্য আয়ের তো নয়ই এমনকি নিম্ন আয়ের দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। তাই বাস্তবতার নিরিখে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ

আকর্ষণের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

বিনিয়োগ বান্ধব মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা

৭.৯১ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে আইএমএফ তাড়িত নব্য-উদারবাদী মুদ্রানীতি চালু আছে। আমাদের মতে বৈদেশিক মুদ্রা রির্জাভ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, বিনিয়োগ বান্ধব মুদ্রানীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ-বান্ধব করা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জরুরি। বিষয়টি আসন্ন বাজেটে উত্থাপিত হওয়া উচিত।

চোরাচালান সমস্যা নিরসন

৭.৯২ চোরাচালান সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে আসন্ন বাজেটে যে সব বিষয়ে সুচিন্তিত নির্দেশনা থাকা জরুরি তা নিম্নরূপ: (ক) যেহেতু মার্চ মাসে ভারতীয় বাজেট ঘোষিত হয়, তাই ভারতের শুল্ক ও কর ব্যবস্থাকে আইটেম ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে যেসব আইটেম চোরাচালানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সেগুলোর উপর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শুল্ক এবং কর হ্রাস/বৃদ্ধি করে দামের পার্থক্য নিরসন করা হলে চোরাচালান কমার কথা। এ উদ্দেশ্যে ট্যারিফ কমিশন এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট কোষ গঠনের প্রস্তাব করছি। (খ) বাংলাদেশের আমদানীকৃত পণ্য ভারতে পাচার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে ঐ আইটেমগুলো চিহ্নিত করে ওগুলোর আমদানী শুল্ক যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা হোক।

কর-রাজস্ব সংশ্লিষ্ট

৭.৯৩ ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যাপক কর-রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা এবং কর-নেটের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর-প্রশাসনের সংস্কারসহ বাজেটে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৭.৯৪ **কর উপদেষ্টা নিয়োগ:** ১৯৮৪ সালের আইন অনুযায়ী বিদেশী নাগরিকরা বাংলাদেশে কর প্র্যাকটিস করতে পারবেনা। কিন্তু, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এ আইন পাশ কাটিয়ে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট বিহীন বিদেশীরা এখানে কর এবং ভ্যাট অফিসে প্র্যাকটিস করছে। অবিলম্বে এসব অবৈধ বিদেশীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমরা সুপারিশ করছি। এসব অবৈধ বিদেশীরা সরকারের জাতীয় বাজেটের মত গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়নের দুঃস্বপ্ন দেখছে। এমনকি তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে অলিখিত প্রস্তাবও রেখেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি–এ অশুভ- অনৈতিক অবস্থার অবসান চায়।

৭.৯৫ ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায়ের বর্তমান কাঠামো অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমান কাঠামোতে দেখা যায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রাপ্তি: উৎসে কর্তন সুত্রে ৪৫.৫০ শতাংশ, পণ্য খাতে ৪৭ শতাংশ এবং সেবা খাতে ৮.১৫ শতাংশ। অপরদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে যে কাঠামো দেখা যায় তা হল: আয়কর খাতে উৎসে কর্তন ৬৪.৩২ শতাংশ, ব্যক্তি খাতে ৯.৯৩ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠান খাতে ২৫.৭৩ শতাংশ আদায় হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে ভ্যাট এবং কর আদায়ের কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। ভ্যাট আদায়ে সেবাখাত ও পণ্য খাতের অংশ তুলনামূলক বৃদ্ধি করলে সার্বিক রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। তবে এ বিষয়ে নির্মোহ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

৭.৯৬ ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মনে করি পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় (৫৪৪-টি উপজেলা) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে থানা/উপজেলা রাজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা জরুরি। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে আর অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানও বাড়বে। আবার ভ্যাট-ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়াদির হালনাগাদসহ জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য ভান্ডারও গড়ে উঠবে। উন্নত দেশে উত্তরণের জন্যও এসব জরুরি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়।

৭.৯৭ **রাজস্ব কমিশন গঠন:** আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের বাজেট তৈরি করা হয় সকল মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং অর্থ বিভাগ তা চুড়ান্ত করে। বাজেট প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়াটা যা তাতে সৃজনশীল চিন্তার সুযোগ কম। প্রক্রিয়াটি মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক যেখানে শতকরা হার হ্রাস-বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে বড়জোর খাতভিত্তিক আয়-ব্যয়ের প্রবণতা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে সমস্যার দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় না এবং বাজেট সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের নিরিখে বাস্তবসম্মত হয় না। এ অবস্থার নিরসনে আমরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজস্ব কমিশন গঠনের প্রস্তাব করছি। এ কমিশনের কাজ হবে প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নের আগে বাজেটের সরকারি আয় বৃদ্ধির পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গতিশীল করা, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সহায়তা প্রদান, পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ, সরকারি ব্যয় ও অপচয় হ্রাস, এবং মধ্য আয়ের দেশ বিনির্মাণে অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরী করা।

৭.৯৮ **ভ্যাট লাইসেন্সধারীদের তথ্য ও ভ্যাট আদায় :** এনবিআর ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, বাংলাদেশের ভ্যাট লাইসেন্সধারীর সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় যে বড় জোর ১ লক্ষ লাইসেন্সধারীর কাছ থেকে (মোট ভ্যাট লাইসেন্সধারীর ১০%) বর্তমানে ভ্যাট আদায় হয়। এটি জাতির সাথে বিরাট

প্রতারণা। আমরা মনে করি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পর্যায়ক্রমে ভ্যাট লাইসেন্সধারীর প্রকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভ্যাট প্রদানকারীর প্রকৃত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এনবিআর এর উচিৎ তার ক্ষমতা বলে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া যাতে আগামী ৩ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৫ লক্ষ ভ্যাট লাইসেন্সধারীকে ভ্যাটের আওতায় সংযুক্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে বাজেটের আকার ১২-১৫ লক্ষ কোটি টাকা শুধু সময়ের ব্যাপার। অর্থনীতির কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর আদায় কাঠামো বিদ্যমান পাবলিক–প্রাইভেট অর্থনীতির কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব। ভ্যাটের আদায় বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে ভ্যাট থেকে মোট যে অর্থ আদায় হয় তার ৬৫ শতাংশ আদায় হয় সরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন, আর ৩৫ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে উৎসে কর্তন। কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতে কাঠামোগত যে পরিবর্তন হয়েছে সেই অনুযায়ী এ আদায়ের অনুপাত ঠিক উল্টো হওয়া যুক্তিসঙ্গত, অর্থাৎ মোট উৎসে কর্তনকৃত আদায়ের ৩৫ শতাংশ হবে সরকারি আর ৬৫ শতাংশ হবে বেসরকারি-প্রাইভেট। অর্থনীতির কাঠামোগত এ পরির্বতন আমলে নিয়ে ভ্যাট আদায় করতে সক্ষম হলে সরকারের মোট রাজস্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে–এ নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ভ্যাট-ট্যাক্স আদায়ের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে পারলে শুধু পরোক্ষ করই নয় প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণও ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হতে পারে ভ্যাট হার ও ট্যাক্স হার পুনঃভাবনা এবং একই সাথে সমগ্র বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আর সেই সাথে "দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" নীতি বাস্তবায়ন করা। এসবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জরুরি।

৭.৯৯ কর ব্যবস্থা যেন অব্যাহতি বহুল (exemption-ridden) না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ বাজেটে উল্লেখ জরুরি।

৭.১০০ সিগারেট, বিড়ি ও ধোয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যে অধিকহারে আবগারী শুল্ক আরোপ: গবেষণায় প্রমাণিত যে সিগারেট ও বিড়ির ক্ষেত্রে মূল্যস্তর ভিত্তিক কর কাঠামো বাতিল করে উচ্চ সমহারে আবগারী শুল্ক আরোপ করা হলে প্রায় ৭০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক সিগারেট সেবনকারী এবং ৩৪ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক বিড়ি সেবনকারী ধূমপান ছেড়ে দেবেন। ৭১ লক্ষ তরুণ সিগারেট সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন এবং ৩৫ লক্ষ তরুণ বিড়ি সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকবেন। বর্তমান মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সিগারেটের কারণে ৬০ লক্ষ এবং বিড়ির কারণে ২৪ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যাবে। এছাড়াও, সরকার সিগারেট থেকে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, বিড়ি থেকে ১ হাজার কোটি টাকা এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য থেকে ১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আসন্ন বাজেটে বিবেচনার জন্য আমাদের সুপারিশ হলো সিগারেটের কয়েক স্তর বিশিষ্ট মূল্য স্তর বাতিল করে প্রতি ১০ শলাকার সিগারেটের উপর কমপক্ষে ৬০ টাকা আবগারী শুল্ক, প্রতি ২৫ শলাকার বিড়ির উপর ১৫ টাকা আবগারী শুল্ক, আর

প্রতি ১০০ গ্রাম ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর ১৫০ টাকা আবগারী শুল্ক আরোপ করা হোক (যা তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC সুপারিশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে রাষ্ট্র হিসেবে আমরা স্বাক্ষরকারী দেশ)। একই সাথে আমরা মনে করি যে বর্তমানে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর যে ১ শতাংশ হারে হেলথ সারচার্জ আছে তা বাড়িয়ে ২ শতাংশ করা উচিত। আহরিত হেলথ সারচার্জ থেকে কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করা সম্ভব। এ রাজস্ব আয় চারটি খাতে ব্যয় করা যেতে পারে : নিকোটিন আসক্তদের মুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক এবং তামাক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি, তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচার), এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয়

৭.১০১ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রাক-বাজেট পর্যালোচনায় সরকারের কাছে কর ও অন্যান্য সুবিধা দাবী করে থাকে। এবছরও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে এ সমস্ত যুক্তি বা দাবী যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক বৈষম্য, অসমতা হ্রাস, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

আয়কর সম্পর্কিত

৭.১০২ কস্ট প্রাইস পদ্ধতিতে সম্পত্তির কর হার: বর্তমান পদ্ধতিতে 'কস্ট প্রাইস'-এর ভিত্তিতে সম্পত্তির যে কর হার প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নিতান্তই কম। প্রতি তিন বছর পরপর সম্পত্তির পুনঃমূল্যায়ন করা যেতে পারে। পূনঃমূল্যায়িত সম্পদের উপর কর ধার্য করা উচিৎ। প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রত্যেক ৩-৫ বছর মেয়াদে প্রতিটি পৌর এলাকায় সম্পত্তির পূনঃমূল্যায়ণ করা হয়। সঠিকভাবে পূণঃমূল্যায়িত সম্পত্তির উপর সম্পদ কর হার প্রয়োগ করলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে।

৭.১০৩ কর প্রশাসনের আওতা: কর প্রশাসনের আওতা জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নেয়া প্রয়োজন। তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগে এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা যোগ্য পরামর্শক সংস্থা নিয়োগ করে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে "করদাতা শুমারী" সম্পন্ন জরুরি। সুনির্দিষ্ট টার্মস-অফ-রেফারেন্স-এর ভিত্তিতে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশে "করদাতা শুমারী" এবং "সম্পদ শুমারীর" কাজ

সম্পাদন করে আগামী অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নে তা ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা মনে করি।

৭.১০৪ রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা, কর হার ও রির্টান ফর্ম সহজীকরণঃ সকল TIN ধারীর (ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী) রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন করার প্রচলন যুক্তিযুক্ত হবে। একইসাথে রিটার্ন ফর্ম করতে হবে সহজবোধ্য এবং ফর্মটি হবে বড়জোর ২ পৃষ্ঠার যেখানে থাকবে নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, সম্পদের বিবরণ (জমি, অর্থ ইত্যাদি), মোট বার্ষিক আয় ও ব্যয়, সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত, প্রদেয় কর (সঞ্চয় ও উদ্বৃত্তের উপর)। আর মানুষকে কর প্রদানে উৎসাহিত করতে এবং একই সাথে কর-রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর-হার কমানো উচিত। ব্যক্তি পর্যায়ে কর হার ৩ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। আর সেটাও হতে হবে 'প্রগেসিভ', বিভিন্ন স্লাবভিত্তিক, বেশি আয় বেশি কর হার নীতিভিত্তিক। কর প্রদান ব্যবস্থা হতে হবে অনলাইন এবং কর আদায় কর্মকর্তারা যেন কর প্রদানকারীদের কোন রকম হেনস্থা করতে না পারেন সে বিষয়ে কার্যকর নিদের্শনা থাকতে হবে (বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ)।

৭.১০৫ TIN ধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ দেশে এখন TIN ধারী মানুষের সংখ্যা ৪০ লাখ ৫৩ হাজার, যাদের মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ মানুষ কর দেন (তাদের মধ্যে ৬-৭ লক্ষ সরকারি চাকুরিজীবী)। এ দেশে TIN ধারী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা হওয়া উচিত কমপক্ষে ৫০ লক্ষ, যাদের ৫০ শতাংশ নিম্নতম কর দেবার যোগ্য। বিষয়টি ভাবতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা আশা করি বিষয়টি বাজেটে যথাযোগ্য স্থান পাবে।

৭.১০৬ বৃহদাংঙ্ক করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ এ দেশে ১০০ জনেরও কম ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করেন। আমাদের হিসেবে বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর দেয়ার যোগ্য মানুষের সংখ্যা হবেন কমপক্ষে ৫০,০০০ জন। অর্থাৎ এ শ্রেণি থেকেই ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে বছরে কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। আর এ অর্থ ব্যয় হতে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য নিরসন-উদ্দিষ্ট খাতসমুহে। আমরা এ কথা আগেও বলেছি। এবারে আবারো আশা করবো বিষয়টি আসন্ন বাজেটে বিবেচনা করা হবে। এ উৎসটিও হতে পারে নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতুর মত যে কোনো বড় মাপের অবকাঠামো বিনির্মাণে অন্যতম সুদবিহীন উৎস।

বাজেটে রাজস্ব আয়ের নতুন উৎস ও সম্ভাবনা

৭.১০৭ বাজেটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মোট ২০টি নতুন উৎস নির্দিষ্ট করেছি যা অতীতে ছিল না। সরকারি আয় বৃদ্ধির নতুন এসব উৎসের মধ্যে থাকবে

অর্থপাচার রোধ থেকে আহরণ, কালো টাকা উদ্ধার থেকে আহরণ, বিদেশী নাগরিকদের উপর কর, বন্ড মার্কেট, সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব, সেবা থেকে প্রাপ্তি কর, সম্পদ কর, বিমান পরিবহন ও ভ্রমণকর, তার ও টেলিফোন বোর্ড, টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, ইন্সুরেন্স রেগুলেটরী কমিশন, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিআইডাব্লিউটিএ, বেসরকারি হাসপাতাল অনুমতি নবায়ন ফিস্, সরকারি স্টেশনারী বিক্রয়, পৌর হোল্ডিং কর ইত্যাদি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমাদের প্রস্তাবিত নতুন ২০টি উৎসের মধ্যে ১৮টি উৎস থেকে (ঘাটতি অর্থায়নের উৎসের ২ খাত বাদে) সরকারের অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতে পারে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার কোটি টাকা যা মোট রাজস্ব আয়ের ১৪ শতাংশ। আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের নতুন এসব উৎসের মধ্যে মাত্র ৩টি উৎস, যেমন 'সম্পদ কর' (৩০ হাজার কোটি টাকা), অর্থপাচার রোধ (৩৫ হাজার কোটি টাকা), এবং কালো টাকা উদ্ধার (৩০ হাজার কোটি টাকা) থেকেই সরকার মোট ৯৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারেন যার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে বছরে ৩টি পদ্মাসেতু নির্মাণ সম্ভব। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নে দুইটি নতুন উৎসের কথা বলা হয়েছে। যা হ'ল "বন্ড মার্কেট" এবং "সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব"। প্রস্তাবিত এ দুইটি নতুন উৎস থেকে পাওয়া সম্ভব ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা যা ৬৯ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করতে সক্ষম (যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ১৬.৭%-এর সমপরিমাণ)।

কালো টাকা উদ্ধার

৭.১০৮ কালো টাকা অথবা মার্জিত ভাষায় অপ্রদর্শিত আয়ের বিষয়টি স্পর্শকাতর। আমাদের মতে এ দেশে পুঞ্জীভূত কালো টাকার আনুমানিক পরিমাণ হবে ৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৭ লক্ষ কোটি টাকা (অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে জিডিপি-র ৪২%–৮০%)। বিষয়টি বাস্তব সত্য। এ অর্থ উদ্ধার প্রয়োজন। একদিকে এমন কোনো পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত হবে না যার ফলে সৎ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অসৎ হতে প্রণোদিত হতে পারেন। অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে কালো টাকা সংশ্লিষ্ট "সিজর ইফেক্ট" কিভাবে সমাধান করা যায় বিষয়টি বাজেটে উল্লেখ জরুরি। এ বিষয়ে সরকার একদিকে যেমন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেন, অন্যদিকে একটি কার্যকর কমিশন গঠন করতে পারেন। আমরা আশা করবো চূড়ান্ত বাজেটে এ কমিশন গঠনের প্রস্তাবসহ শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা থাকবে। আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে আমরা ৩০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা উদ্ধারের প্রস্তাব করছি।

৭.১০৯ আসন্ন বাজেটে আমরা Money Changer Company সমূহের কার্যক্রমের উপর নজরদারী জোরদার করার প্রস্তাব করছি।

অর্থপাচার রোধ

৭.১১০ দেশ থেকে এখন বছরে ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থপাচার হচ্ছে। বাজেটে এ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগত নিদের্শনা থাকতে হবে। আমরা অর্থপাচার রোধ থেকে আগামী অর্থবছরে ৩৫ হাজার কোটি টাকা আদায়ের প্রস্তাব করছি। একই সাথে মাদক চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে চলমান সরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি। মাদক চোরাচালানের সাথে কালো টাকা ও অর্থপাচার উভয়ই সম্পর্কিত। একইভাবে জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড অর্থায়নের সাথেও কালো টাকা ও অর্থপাচার উভয়ই সম্পৃক্ত।

দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, সংস্থার সাথে লেনদেন

৭.১১১ দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রপরিচালনায় দায়িত্বশীলদের রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান, সংস্থার সাথে লেনদেন নিষিদ্ধ করতে হবে। এ নীতি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান থাকতে হবে। "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স" (শূন্য সহিষ্ণুতা)-এর নীতি আপসহীনভাবে কার্যকর করতে হবে। "রেন্টসিকিং" অর্থনীতিতে বিষয়টি সহজ নয়, তবে তা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আবশ্যিক শর্ত।

অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন

৭.১১২ গত বছরের বাজেটে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আর্থিক বরাদ্দের কোন উল্লেখ ছিল না। আমরা মনে করি এবারের বাজেটে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা জরুরি।

কৃতি গবেষকদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চায় প্রণোদনা

৭.১১৩ বিদেশে অবস্থানরত/কর্মরত কৃতি গবেষকরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন এবং উৎসাহিত বোধ করেন সে লক্ষ্যে প্রণোদনার বিষয়টি এবারের বাজেটে যথামাত্রা গুরুত্বের সাথে থাকা উচিত ।

৭.১১৪ মেধাস্বত্ব অধিকার

বিশ্বায়নের যুগে মেধাস্বত্ব অধিকার (Intellectual Property Right) একটি বাস্তব বিষয়। উন্নত বিশ্ব মেধাস্বত্ব অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করছে; আমরা পিছিয়ে আছি। এ ক্ষেত্রে পিছনে থাকার তেমন কোন যুক্তি নেই যখন দাবি করার মতো আমাদের অনেক কিছুই আছে। যেমন আমাদের লোকজ শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টির অনেক কিছুই আছে (লালন গীতি-হাছন রাজা ও অনেকে) যার "কপিরাইট" নিশ্চিত করে আমরা খুব সহজেই বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা

অর্জন করতে সক্ষম। সে ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দেশজ-সৃজনশীল প্রতিভার মানুষেরা পাবেন আর্থিক স্বীকৃতি আর অন্যদিকে দেশ পাবে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিষয়ে এবং একই সাথে আর্থিক স্বচ্ছলতা। এসবের পাশাপাশি আছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত গবেষকদের সৃজনশীল কর্মকান্ড যা তারা আমাদের দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যেমন, অধ্যাপক আবুল হুসসামের খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত করার প্রযুক্তি–সনো ফিল্টার (যে উদ্ভাবনের জন্য তিনি ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় একাডেমি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর মিলিয়ন ডলার গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ এওয়ার্ডে ভূষিত হন); অধ্যাপক মাকসুদুল আলম-এর পাটের জিনরহস্য উদঘাটন ইত্যাদি। বিশ্বায়নের যুগে মেধাস্বত্ব অধিকার-এর এসব সুবিধা নেবার বিষয়ে ভাবতে হবে। বিষয়টি বাজেটে উত্থাপিত হওয়া জরুরি। আসন্ন বাজেটে "বাংলাদেশ মেধাস্বত্ব কমিশন" গঠন করার প্রস্তাব থাকলে ভাল হয়। বিশ্বায়ন ও মেধাস্বত্ব নিয়ে যেহেতু ভাবনা জরুরি সেহেতু বলা প্রয়োজন যে বিশ্বে এখন চলছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব–তথ্য ও প্রযুক্তি মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন ধারা। এ বিপ্লবে সক্রিয় অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করতে হলে আমাদের "উদ্ভাবন নীতি-কৌশল" (Innovation Policy and Strategy) বিনির্মাণ করতে হবে, "বাণিজ্য উন্নয়ন সহায়ক চুক্তি" (Trade Facilitation Agreement) নিয়ে ভাবতে হবে, এবং অবকাঠামো বিনির্মানে (যেমন নৌ ও স্থল বন্দর) সক্রিয় হতে হবে। বাজেটে এসবের প্রতিফলন কাম্য।

বাজেটে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য আরো কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ বিষয়

৭.১১৫ বাজেটে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বর্পূণ বিষয় আমরা বেশ কয়েকবছর ধরে বলছি কিন্তু তেমন কাজ হচ্ছে না। বিষয়গুলি আবারও এবারের বাজেটে এবং জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার জন্য উপস্থাপন করছি। বিষয়গুলি নিম্নরূপ: (ক) জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণার অন্তত ছয়মাস আগে বাজেটের মূল বিষয়াদি (প্রধান ব্যয়খাত অনুযায়ী অনুমিত/সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ, উৎস অনুযায়ী সম্ভাব্য আয়, ইত্যাদি) প্রকাশ করা উচিত। (খ) উন্নয়ন বাজেটে অর্থবছরের মাঝখানে অননুমোদিত কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। (গ) সকল ধরনের দুর্নীতি, দুর্নীতির উৎস ও দুর্নীতি নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। (ঘ) বছরের ১ জানুয়ারি কিংবা ১ এপ্রিল থেকে অর্থ-বছর গণনা করা হোক।

অনুচ্ছেদ ৮

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট ২০১৯-২০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গত অর্থবছরে সমিতির ইতিহাসে পরপর চতুর্থ বারের মত "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করে। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের এবারের প্রয়াস "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৯-২০"।

আমাদের এ বছরের বিকল্প বাজেট প্রস্তাবটির এক ভিন্ন মাত্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, আর তা হ'ল আগামী বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। আমাদের এই প্রয়াসের হিসেব পদ্ধতি ও অনুসিদ্ধান্তসহ ফলাফলসমূহ দেশবাসীসহ জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি। যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ইতিহাসে এই বার পঞ্চম বছর আমরা "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাবনা হাজির করছি সেহেতু বৈশিষ্ট্যসূচক মূল বিষয়সমূহ উল্লেখ জরুরি। আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটটি কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে মৌলিক এবং গতানুগতিক নয় বিধায় আপাত বেশ কিছু বিষয় গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আমাদের প্রস্তাবিত "বিকল্প বাজেট" রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শগত কারণেও এখনকার নীতি-নির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে "মুক্তবাজার-মুক্তবাণিজ্য-মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা" ভিত্তিক নব্য-উদারবাদী মতবাদ (যা সাম্রাজ্যবাদসহ বিদেশী দাতা গোষ্ঠী আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে) বাতিল ঘোষণাপূর্বক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাউদ্ভূত আমাদের সংবিধানের বিধি মোতাবেক সংবিধানের চার মৌল স্তম্ভভিত্তিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও অসাম্প্রদায়িক মনন-মানসকাঠামো বিনির্মাণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ তত্ত্ব কাঠামো গ্রহণ করেছি। বাজেটসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশ থেকে ধার করা নয় অথবা আমাদের উপর বহিঃশক্তির চাপিয়ে দেয়া নয় "দেশজ মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন"ই সঠিক পথ বলে বিবেচনা করি। যা ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন। আমরা এ বিষয়েও সচেতন যে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো এবং নীতি-নির্ধারণে শ্রেণি স্বার্থ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে প্রণীত বাজেট-দর্শন গ্রহণে বাধা হবে। এত কিছুর পরেও আমরা "বিকল্প বাজেট" প্রস্তাব করছি নিদেনপক্ষে এ কারণেও যে আমরা বুঝাতে চাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব– যৌক্তিক, নৈতিক, মানবিক সব বিচারেই তা সম্ভব; সম্ভব এ দেশের দ্রুত উন্নয়ন; সম্ভব উন্নত বাংলাদেশ গড়া; সম্ভব বৈষম্যহীন সমাজ গড়া; সম্ভব অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ সৃষ্টি। এক কথায় সম্ভব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা" বিনির্মাণ।

এতক্ষণ নীতি-দর্শনগত যে মৌলকথন হল সেসবের ভিত্তিতে "বিকল্প বাজেট" প্রণয়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে যে সকল বিষয় বা 'অনুসিদ্ধান্তের' উপর আমরা বিশেষ জোর দেবার ও অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভেবেছি সেগুলি নিম্নরূপ:

(১) **সাংবিধানিক ভিত্তি:** বাজেট প্রণয়নে আমরা সংবিধানের বিধানসমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়েছি। প্রচলিত বাজেটে যা কিছু সংবিধানের সাথে সাযুজ্যহীন অথবা অসংগতিপূর্ণ অথবা বিরোধাত্মক এ ধরনের সবকিছু আমরা বর্জন করেছি [আমাদের 'সচেতন-বর্জিত' বিষয়াদি সংবিধানের ৭(১) ও ৭(২) অনুচ্ছেদে "সংবিধানের প্রাধান্য"-এর সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ]।

(২) **রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকা:** অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়া-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ও ফলপ্রদ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ স্বীকার করে (যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ব্যয়বরাদ্দ নির্ণয় করেছি। আমরা, এখনকার তুলনায় 'পরিচালন' ব্যয়ের (যা অতীতে 'অনুন্নয়ন' ব্যয় বলে পরিচিত ছিল) চেয়ে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ বেশি ধরেছি এবং একই সাথে উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি করেছি।

(৩) **দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা প্রদানকারী খাত:** বাজেট বরাদ্দে সেসব খাত-ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছি যেসব খাত দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, যেসব খাতের বরাদ্দে সামাজিক অভিঘাত হয় ধনাত্মক, যেসব খাতের বরাদ্দ দেশজ শিল্পায়ন, কৃষির উন্নয়ন ও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

(৪) **আয় ও ব্যয়ের কাঠামোগত রূপান্তর:** বাজেটের আয় ও ব্যয় খাতে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেছি।

(৫) **বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতাবিহীন:** কোন ধরণের বৈদেশিক ঋণ ছাড়াই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৬) **রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে বিত্তবান-ধনীদের উপর যুক্তিসঙ্গত চাপ প্রয়োগ:** বৈষম্য হ্রাসের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর (অর্থাৎ দরিদ্র-নিম্নবিত্ত–নিম্নমধ্যবিত্ত) তুলনায় বিত্তবান-ধনীদের উপর যৌক্তিক কারণেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর চাপ প্রয়োগ করছি।

(৭) **ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান:** ধনী ও বিত্ত-সম্পদশালী ব্যক্তি এবং /অথবা প্রতিষ্ঠান যারা সঠিক কর প্রদান করেন না তারা যেন সঠিক পরিমাণ কর প্রদান করেন তা বিবেচনা করেছি। একই সাথে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর হার নির্ধারণ করেছি।

(৮) **পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত:** পরোক্ষ করের বোঝা মূলত দরিদ্র-প্রান্তিক-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্তদের উপর তাদের আয়ের তুলনায় অধিক হারে চাপ প্রয়োগ করে ফলে তা দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস করে না। সে কারণে পরোক্ষ করের তুলনায় প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বেশি নির্ধারণ করেছি।

(৯) **ব্যক্তি-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ:** বাজেটের প্রতিটি আয় খাত ও সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে প্রতিটি খাত-উপখাতে সম্ভাব্য অধিক পরিমাণ আয় নির্দ্ধারণ করেছি এবং এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছি।

(১০) **কোন আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক:** কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের সেসব খাত অনুসন্ধান করা হয়েছে যেসব খাত থেকে কোন আয়ই আসে না অথচ সম্ভাবনা অনেক। একই সাথে সেসব খাত চিহ্নিত করেছি যেসব খাত থেকে স্বল্প আয় আসে অথচ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক যদি একটু উদ্যমী হওয়া যায় এবং কর-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা যায়।

(১১) **উন্নয়ন দর্শনের কারণে বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার:** যে উন্নয়ন দর্শন সঠিক বলে আমরা মনে করি সে কারণেই বাজেট বরাদ্দে আমাদের অগ্রাধিকারক্রম সরকারের বাজেটের চেয়ে ভিন্নতর। তা শুধু খাত ভিত্তিকই নয়, অভিঘাত ভিত্তিকও; এবং তা মোট বরাদ্দ বিবেচনা ভিত্তিকও। আমাদের প্রস্তাবনায় মোট বাজেটের হিসেবে অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী খাতসমুহ হল: শিক্ষা ও প্রযুক্তি, জনপ্রশাসন, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, সুদ, কৃষি, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা, গৃহায়ণ, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১২) **মানব উন্নয়ন ও মানব সম্পদ-উন্নয়ন:** মানব উন্নয়ন ও মানব সম্পদ-উন্নয়নসহ উৎপাদনশীল বিনিয়োগে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতাদূরসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (কৃষকের শস্য বীমা ও ভূমি সংস্কার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম)-র ব্যয় খাতের বরাদ্দে আমরা যুক্তিসঙ্গত অগ্রাধিকার দিয়েছি।

(১৩) **আমদানি শুল্কহার নির্দ্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষি:** আমদানি শুল্কহার নির্দ্ধারণে দেশজ শিল্পায়ন ও দেশজ কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত-উপখাতসমূহের ক্ষেত্রে মুক্তবাজার দর্শনের বিপরীতে সংরক্ষণবাদ দর্শন প্রয়োগ করেছি।

(১৪) **বাজেটে আয় ও ব্যয় বরাদ্দ-এর পরিমাণ:** উল্লিখিত সব কিছু বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত যে হিসাব দাঁড়িয়েছে সেখানে আমাদের বিকল্প বাজেটে আয় ও ব্যয় বরাদ্দ-এর পরিমাণ হবে সরকার সম্ভাব্য যে পরিমাণ (অর্থ) প্রস্তাব করতে যাচ্ছে তার

তুলনায় দ্বিগুণের কিছু বেশি। তবে সুনির্দিষ্ট অনেক খাত-উপখাতে যুক্তিসঙ্গত কারণেই তা বহুগুণ বেশি।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখিত পদ্ধতিগত বিষয়াদিসহ অনুসিদ্ধান্তসমূহের প্রয়োগে আমরা আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য যে বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করছি তার মোট আকার (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০ কোটি টাকা– যা গত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবকৃত বাজেটের তুলনায় ২.৬৭ গুণ বেশী। গত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) সরকারের মোট বাজেট ছিল ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। আমরা অনুমান করি যে আমাদের প্রস্তাবিত বৃহদাকার বাজেট নিয়ে বেশ কথাবার্তা-সংশয়-সন্দেহ হতে পারে। তবে যুক্তি থাকলে আমাদের প্রস্তাব বর্জন করার কোনই কারণ নেই। কারণ নেই এ কারণেও যে আমরা বেশ দ্রুত গতিতেই স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল হয়ে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে চলেছি।

আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন কোথায়?

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য আমরা আজ (২৫ মে ২০১৯) যে বাজেট উপস্থাপন করছি তা "বিকল্প বাজেট"। আর এ বিকল্প বাজেটটি আমরা উপস্থাপন করছি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবাকারে যে দিন খসড়া বাজেট উপস্থাপন করবেন (আমাদের জানামতে ১৩ জুন ২০১৯) তার ১৮ দিন আগে। অর্থাৎ সরকার আসন্ন বাজেটে এখন থেকে ১৮ দিন পরে হুবহু কি বলবেন তা আমরা জানি না। তবে আমরা আমাদের বিকল্প বাজেট ভাবনার মূল বিষয়াদি ইতোমধ্যে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে মত বিনিময় সভায় লিখিতভাবে জানিয়েছি। এখানে আরো বলা প্রয়োজন যে যেহেতু আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আমরা এখনও জানি না সেহেতু ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলনা করা হবে সরকারের গত অর্থবছরের (২০১৮-১৯) বাজেটের সাথে।

আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য আমরা যে বাজেট প্রস্তাব করছি তাতে বেশ কিছু মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হবে। আমাদের প্রস্তাবিত ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০ কোটি টাকার বাজেটের অন্যতম প্রধান পরিবর্তন সূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ (সারণি ১ও ২ দেখুন):

১. প্রস্তাবিত বাজেটের আকার হবে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০ কোটি টাকা যা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে খসড়া বাজেট প্রস্তাব করতে যাচ্ছেন (সম্ভবত ৫ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা বা এ পরিমাণের কিছু কমবেশি) তার চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ বেশি। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হ'ল দ্রুত সম্প্রসারণশীল বৃহদায়তন বাজেট। কারণ

হিসেবে আমরা আগেই বলেছি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট যুক্তিসঙ্গত এবং তা দেশের অর্থনীতির অর্ন্তনিহিত শক্তি বিচারেও যৌক্তিক।

২. আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের রাজস্ব আয় থেকে আসবে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৮১ শতাংশের যোগান দেবে সরকারের রাজস্ব আয়। আর বাজেটের বাকী ১৯ শতাংশ অর্থাৎ ঘাটতি অর্থায়নে (২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা) যোগান দেবে সম্মিলিতভাবে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব (মোট ১ লক্ষ কোটি টাকা যেখান থেকে আসবে ঘাটতি অর্থায়নের ৪২%), বন্ড বাজার (মোট ৬৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা; অর্থাৎ ঘাটতি অর্থায়নের ২৭%), সঞ্চয় পত্র থেকে ঋণ গ্রহণ (মোট ৫০ হাজার কোটি টাকা; ঘাটতি অর্থায়নের ২১%), এবং দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ (মোট ২৩ হাজার কোটি টাকা; ঘাটতি অর্থায়নের ১০%)। তবে আমাদের প্রস্তাবে ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক ঋণ-নীট-এর কোন ভূমিকা থাকবে না, যা গত বছরের সরকারী বাজেটে ঘাটতি পূরণে ৪১ শতাংশ ভূমিকা রেখেছিল। অর্থাৎ আমাদের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা বৈদেশিক ঋণের দ্বারস্থ হতে চাই না।

৩. আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব থেকে আয় হবে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা, যা সরকার গত বছরে যে প্রস্তাব করেছিলো তার চেয়ে প্রায় ৩ গুণ (২.৯২ গুণ) বেশি; আর প্রস্তাবিত মোট ব্যয় বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন মিলে) হবে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০ কোটি টাকা যা গত বছরের সরকারি বাজেটের তুলনায় ২.৬৭ গুণ বেশী।

৪. আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট অর্থায়নে কোন বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হবে না। সুদাসলসহ বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্ত হবার পক্ষে আমাদের অবস্থান। আর যদি কোন অনুকূল শর্তের বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্তির পথ থেকে থাকে সে বিষয়ে আমরা ঋণদাতাদের সাথে সম্মানজনক অবস্থান বজায় রেখে আলাপ-আলোচনার পক্ষে (যেমন ধরুন আমরা কারো কাছে যদি ১০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে থাকি আর ইতোমধ্যে তা পরিশোধ করার পরেও ৫০ কোটি টাকার ঋণী হয়ে থাকি তা নিয়ে আমরা অর্থনৈতিক কুটনীতি করতে ইচ্ছুক; অথবা টাকার বিনিময় মূল্যের (exchange rate) কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করে সুরাহা করতে ইচ্ছুক)।

৫. আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কাঠামোতে গুণগত রূপান্তর ঘটবে। মোট বরাদ্দ ও আনুপাতিক বরাদ্দে উন্নয়ন বাজেট হবে পরিচালন বাজেটের চেয়ে অনেক বেশী যা এখন ঠিক উল্টো। এখন উন্নয়ন-পরিচালন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত ৩৯:৬১, যা আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে হবে ৫৭:৪৩। আমাদের প্রস্তাবনায় উন্নয়ন বরাদ্দ এখনকার তুলনায় ৩.৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ লক্ষ ১ হাজার ৩৫০ কোটি টাকায়

উন্নীত হবে, আর পরিচালন বরাদ্দ এখনকার তুলনায় ১.৮৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৪০ কোটি টাকায় উন্নীত হবে। আমাদের প্রস্তাবনায় পরিচালন বাজেট বরাদ্দ যে এখনকার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে তার প্রধান কারণ আমরা ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যৌক্তিক মনে করি যেখানে বেতন-ভাতা ও সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ পরিচালন বাজেটভুক্ত।

৬. আমাদের প্রস্তাবনানুযায়ী বাজেটের আয় কাঠামোতে মৌলিক গুণগত রূপান্তর ঘটবে। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের মোট রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) হবে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৬৯ শতাংশ হবে প্রত্যক্ষ কর এবং ৩১ শতাংশ হবে পরোক্ষ কর। কাঠামোগত এ পরিবর্তনটি মৌলিক। কারণ সরকার-প্রস্তাবিত চলমান অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের (প্রাপ্তির) ৪৮ শতাংশ ছিল প্রত্যক্ষ কর এবং ৫২ শতাংশ ছিল পরোক্ষ কর (সারণি ৩ দেখুন)। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের আয় কাঠামোতে যেহেতু বিত্তশালী ও ধনীদের উপর করের বোঝা অতীতের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং একই সাথে যেহেতু ব্যয় কাঠামো হবে প্রগতিমুখী সেহেতু আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেট বাস্তবায়ন করলে তা যৌক্তিক কারণেই সমাজে আয়-বৈষম্য, ধন-বৈষম্য, সম্পদ-বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য ও ক্রমবর্ধমান অসমতা হ্রাস করবে। সুতরাং, আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প বাজেটকে "বঙ্গবন্ধুর চেতনার দেশের মাটি থেকে উত্থিত বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শন" হিসেবে অভিহিত যুক্তিযুক্ত।

আমাদের বাজেট প্রস্তাবনায় উল্লেখযোগ্য আয় বৃদ্ধি

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত ২০১৮-১৯ সালের জাতীয় বাজেটে মোট রাজস্ব ধরা হয়েছিল ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। আর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে আমরা ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ আয় ২.৯২ গুণ বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। আয়ের উপখাত ওয়ারী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে "জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত আয়" সরকারি প্রস্তাবনায় ছিলো ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ২০১ কোটি টাকা (যা ছিলো মোট আয়ের ৮৪.৩%)- আমাদের প্রস্তাবনায় এ আয় ২.২৭ গুণ বেড়ে দাঁড়াবে ৬ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৬০ কোটি টাকায় (যা আমাদের প্রস্তাবিত মোট আয়ের ৬৭%)। আয়ের উপখাত "আয় ও মুনাফার উপর কর" থেকে গত বছরে (অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে) সরকার প্রস্তাবিত বাজেটে ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ৭১৯ কোটি টাকা (মোট আয়ের ২৯.৩৪%) –এ খাতে আমরা ৩.৬৩ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি, যার ফলে এ উপখাত থেকে আয় হবে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকা (যা প্রস্তাবিত মোট আয়ের ৩৬.৫%)। "মূল্য সংযোজন কর" খাতে আমরা বর্তমানে সরকার প্রস্তাবিত ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকার (৩২.২০%) ১.৩৫ গুণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি–ফলে আমাদের প্রস্তাবনায় আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'মূল্য সংযোজন কর' থেকে আয় হবে মোট ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা (যা আমাদের প্রস্তাবিত মোট আয়ের ১৪.৮৪%)।

"জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর"-এর অন্তর্ভুক্ত খাত-উপখাত বিচারে আমরা প্রচলিত ছকের বাইরে বেরিয়ে নতুন কিছু উৎস থেকে আয়ের প্রস্তাব করেছি। যেমন বিদেশী নাগরিকদের উপর কর ৬ হাজার কোটি টাকা; সেবা খাতের কর ৫ হাজার কোটি টাকা; সম্পদ কর ৩০ হাজার কোটি টাকা; বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এসবই নতুন উৎস থেকে কর আহরণ প্রস্তাবনা।

"জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত কর" খাতে আমরা সরকারের বর্তমান নির্ধারিত ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা ৬.১৭ গুণ বৃদ্ধি করে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হচ্ছে মাদক শুল্ক খাতে ১০২ কোটি টাকা থেকে ১৬ হাজার কোটি টাকা (১৫৬.৮৬ গুণ বৃদ্ধি), যানবাহন কর ১ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা, ভূমি রাজস্ব খাতে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা। সরকারের "মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" ও "দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা" নীতির প্রেক্ষিতে আমাদের এসব প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা প্রশ্নাতীত।

"কর ব্যতীত প্রাপ্তি" উপখাতে আমাদের প্রস্তাবনা হলো: লভ্যাংশ ও মুনাফা খাতে এখনকার (২০১৮-১৯ অর্থবছরের) ৩ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা থেকে ১০.২৮ গুণ বৃদ্ধি করে ৩৫ হাজার কোটি টাকা, সুদ খাতে ৫ হাজার ৪৬২ কোটি থেকে বৃদ্ধি করে ৭ হাজার কোটি টাকা, জরিমানা, দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ উপখাতে ৬০১ কোটি টাকা থেকে ৮৩ গুণ বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার কোটি টাকা, কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব প্রাপ্তিতে ৯ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ হাজার কোটি টাকা, রেলপথে ৮ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়াও আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব হলো, পৌর হোল্ডিং কর ৪ হাজার কোটি টাকা, বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২ হাজার কোটি টাকা, ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির লাইসেন্স ও নবায়ন (প্রতিবছরে) ফি ২ হাজার কোটি টাকা, বিউটি পার্লার সেবা কর খাতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হাউস-এর ক্যাপাসিটি কর থেকে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং বিদেশী পরামর্শক ফি বাবদ ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আমরা 'কর ব্যতিত প্রাপ্তি' উপখাতে বর্তমান ৩৭ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা থেকে ৭.২৪ গুণ বৃদ্ধি করে মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা আদায়/প্রাপ্তি প্রস্তাব করছি।

আসন্ন বাজেটে সরকারের আয়ের উৎস নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাবনা হলো অর্থপাচার রোধ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা এবং কালো টাকা উদ্ধার থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা আহরণ করা। অর্থপাচার রোধ ও কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে সরকারপ্রধান দুশ্চিন্তিত এবং বর্তমান সরকার ২০১৮-এর নিবার্চনী ইশতেহারে প্রসঙ্গটি উত্থাপন পূর্বক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পথনির্দেশ হিসেবেই অর্থপাচার রোধ ও কালো-টাকা উদ্ধার সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা।

আমাদের বাজেট প্রস্তাবনায় উল্লেখযোগ্য ব্যয় বৃদ্ধি

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত: শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের মোট বরাদ্দ (পরিচালন +উন্নয়ন) ছিল ৬৭ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা (যা জিডিপি-র ১.৯%-এর সমান)। বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল এবং পরে উন্নত দেশে রূপান্তরে মানব শক্তি উন্নয়নের কোনই বিকল্প নেই। আর অন্তত: সে কারণেই শিক্ষার অগ্রাধিকার এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আমরা এ খাতের জন্য আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ নির্ধারণ করেছি যা চলমান বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৪.১৯ গুণ বেশি। শিক্ষায় আমাদের এ বরাদ্দ প্রস্তাব বর্তমান জিডিপি-র ২.৪ শতাংশের সমান। আমরা এ বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে জিডিপি-র ৮ শতাংশে উন্নীত করার পক্ষে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য শিক্ষা খাতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দের মধ্যে "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা" খাতে চলমান বছরের সরকারি বরাদ্দ ২২ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকার স্থলে ৮৫ হাজার কোটি টাকা (৩.৭৮ গুণ বৃদ্ধি) প্রস্তাব করছি। "মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ' উপখাতে সরকারের মোট ২৪ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকার বরাদ্দ ৩.৪২ গুণ বৃদ্ধি করে আমাদের সমিতির প্রস্তাব ৮৫ হাজার কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সরকারি বাজেট ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকার বিপরীতে আমরা ৩.৪৪ গুণ বৃদ্ধি করে ৪২ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। মূলত আইসিটি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারি বরাদ্দ ২ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার জায়গায় আমাদের প্রস্তাব ৫২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা সরকারি প্রস্তাবের তুলনায় ১৯.৫৮ গুণ বেশী, 'কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ' খাতে সরকারি বরাদ্দ ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বিপরীতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকা যার মধ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা যাবে কারিগরী শিক্ষা খাতে (উচ্চ উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়তে প্রয়োজন দক্ষ জনসম্পদ)।

স্বাস্থ্য খাত: স্বাস্থ্য খাতের অবস্থা যথেষ্ট মাত্রায় বেহাল; এ খাত এখন বৈষম্য সৃষ্টি ও দারিদ্র্য সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান (২০১৮-১৯ অর্থবছরে) সরকারি বরাদ্দ ২৩ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ ৪ গুণ বৃদ্ধি করে ৯৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। আমরা মনে করি বর্ধিত স্বাস্থ্য বরাদ্দ সেই সব খাত-উপখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবাহিত করা সমীচীন হবে যার ফলে জনগণের সুস্বাস্থ্য-মধ্যস্থতাকারী জীবন-সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। আর সে লক্ষ্যে বর্ধিত স্বাস্থ্য বরাদ্দ যে সব খাত-উপখাতসহ মানুষের জন্য উদ্দিষ্ট হতে হবে তার মধ্যে থাকবে প্রাথমিক-মধ্যবর্তী-উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা (primary, secondary, tertiary health care); সব ধরণের "দারিদ্র্যের রোগ" (যক্ষা, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ার মা ও শিশু স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, হাম, খাবার পানিতে আর্সেনিক উদ্ভুত আর্সোনোকোসিস রোগ); গ্রামের ও নগরের দরিদ্র-প্রান্তস্থ মানুষ; এবং ভবিষ্যত জন-স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জেনোমিক মেডিসিন-এ বিনিয়োগ (শেষোক্ত এ বিনিয়োগটি রাষ্ট্রকে পরিকল্পিতভাবে

করতে হবে যার অন্তর্ভুক্ত হবে জেনোমিক মেডিসিন উৎপাদনে প্রণোদনা, গবেষণা ও উন্নয়ন-R & D ব্যয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়াদির পাশাপাশি যে বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহ বিবেচনা করেছি তা হল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি "গ্রাম হবে শহর" এর আওতায় সম্ভাব্য সব ধরণের স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা প্রদানে যথাসাধ্য বিকেন্দ্রীভূত করার মত কাঠামো গড়ে তোলা। স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ নিয়ে আপোষ হবে আত্মঘাতী।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাত: সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে এখন সরকারি বরাদ্দ ২৭ হাজার ১৫৬ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়ে ৮০ হাজার ২৫০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে আমরা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৩ হাজার ৪৮৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা; মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৪ হাজার ২৬১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৯ হাজার কোটি টাকা; খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এখনকার বাজেট বরাদ্দ ৪ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮ হাজার কোটি টাকা; এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর বাজেট এখনকার তুলনায় ২.২৮ গুণ বৃদ্ধি করে ২২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত: আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটে মোট ১৫-টি বৃহৎবর্গীয় খাতের মধ্যে "বিদ্যুৎ ও জ্বালানী" চতুর্থ বৃহত্তম বরাদ্দপ্রাপ্তিযোগ্য খাত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে সরকারি বরাদ্দ এখন ২৪ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ ৫.৬৪ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। যার মধ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বর্তমান ১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার বরাদ্দ ১০.২৫ গুণ বৃদ্ধি করে ২০ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ বিভাগে ২২ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকার বরাদ্দ ৫.২৪ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ২০ হাজার ২৫০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। আর বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেটে আমাদের প্রস্তাবে আছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০ হাজার কোটি টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ বিতরণে ৬০ হাজার কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বাজেট বরাদ্দ–আমাদের নতুন প্রস্তাব যা সরকারের বাজেটে ভিন্নভাবে দেখানো হয় না।

পরিবহন ও যোগাযোগ খাত: পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বর্তমান সরকারি বরাদ্দ (২০১৮-১৯ অর্থবছরে) ৫৬ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা। আমরা এ বরাদ্দ ২.৬৩ গুণ বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি। উপখাত হিসাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য বর্তমান সরকারি বরাদ্দ ২৪ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪৭ হাজার কোটি টাকা, সেতু বিভাগে ৯ হাজার ১১৪ কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২২ হাজার ৫০ কোটি টাকা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ১৪ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩৭ হাজার কোটি টাকা, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান বরাদ্দ ৩

হাজার ৫৩৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২১ হাজার ২০০ কোটি টাকা, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ১ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বর্তমান বরাদ্দ ৩ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে যে, প্রস্তাবিত বাজেটে অনেক যৌক্তিক কারণেই অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব কারণের অন্যতম হলো শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলা, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি, সমতাভিমুখী সমাজ-অর্থনীতি গড়ে তোলার ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, মধ্যআয়ের দেশ ও উন্নত দেশ বিনির্মাণ, এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

ঋণের সুদ: বৈদেশিক ঋণের সুদাসল পরিশোধ বাবদ আমরা এ বছর ৭ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি। গত বছর বৈদেশিক ঋণের সুদ খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা। আমরা চাই একদিকে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করতে আর অন্যদিকে পাশাপাশি চাই মূল ঋণ ও সুদ পরিশোধে রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক কুটনীতি জোরদার করতে। স্বৈরাচার শাসনামলে যে সব বিদেশী ঋণ নেয়া হয়েছিল সে সবের দায়ভার নিয়ে আমরা ঋণদাতাদের সাথে আলোচনার পক্ষে। এসবই আমাদের নীতিগত অবস্থান। আমরা ঋণগ্রস্থ জাতি হবার দৈন্য দেখাতে চাই না।

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা মোট ২০টি নতুন উৎস নির্দেশ করেছি যা অতীতে ছিল না। সরকারি আয় বৃদ্ধির নতুন এসব উৎসের মধ্যে থাকবে অর্থপাচার রোধ থেকে আহরণ, কালো টাকা উদ্ধার থেকে আহরণ, বিদেশী নাগরিকদের উপর কর, বিদেশী পরামর্শক ফিস্, বন্ড মার্কেট, সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব, সেবা থেকে প্রাপ্তি কর, সম্পদ কর, তার ও টেলিফোন বোর্ড, টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, ইন্সুরেন্স রেগুলেটরী কমিশন, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বিআইডাব্লিউটিএ, বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক অনুমতি নবায়ন ফিস্, ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির লাইসেন্স ও নবায়ন ফিস্, সরকারি স্টেশনারী বিক্রয়, ইত্যাদি। আসন্ন ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমাদের প্রস্তাবিত নতুন ২০টি উৎসের মধ্যে ১৮টি উৎস থেকে (ঘাটতি অর্থায়নের উৎসের ২ খাত বাদে) সরকারের অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হতে পারে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার কোটি টাকা যা মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ১৪ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের নতুন এসব উৎসের মধ্যে মাত্র ৩টি উৎস, যেমন 'সম্পদ কর' (৩০ হাজার কোটি টাকা), অর্থপাচার রোধ (৩৫ হাজার কোটি টাকা), এবং কালো টাকা উদ্ধার (৩০ হাজার কোটি টাকা) থেকেই সরকার মোট ৯৫ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারেন যা সরকারের চলতি বছরের শিক্ষা-প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য খাতে সম্মিলিত ব্যয়ের তুলনায় ৪ হাজার কোটি টাকা বেশি অথবা বিদ্যুত ও জ্বালানী খাতে বরাদ্দের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নে

দুইটি নতুন উৎসের কথা বলা হয়েছে। যা হ'ল "বন্ড মার্কেট" এবং "সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব"। প্রস্তাবিত এ দুইটি নতুন উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা যা ৬৯ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করতে সক্ষম (যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির ১৬.৪ শতাংশের সমপরিমাণ)।

সারণি ১: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে আয়ের বাজেট

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯: সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট*		২০১৯-২০: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের জন্য প্রস্তাবিত আয়ের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কতগুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	করসমূহ হইতে প্রাপ্তি					
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ					
১০০	আয়, মুনাফা ও মূলধনের উপর কর	১০০,৭১৯	২৯.৩৪	৩৬৬,০০০	৩৬.৫১	৩.৬৩
৩০০	মূল্য সংযোজন কর	১১০,৫৫৫	৩২.২০	১৪৮,৭৬০	১৪.৮৪	১.৩৫
৪০০	আমদানি শুল্ক	৩২,৫৫৩	৯.৪৮	৬০,০০০	৫.৯৮	১.৮৪
৫০০	রপ্তানি শুল্ক	৩৬	০.০১	৩০০	০.০৩	৮.৩৩
৬০০	আবগারী শুল্ক	২,০৯০	০.৬১	৩,০০০	০.৩০	১.৪৪
৭০০	সম্পূরক শুল্ক	৪৮,৭৬৬	১৪.২০	৪৩,০০০	৪.২৯	০.৮৮
	বিদেশি নাগরিকদের উপর কর	০	০.০০	৬,০০০	০.৬০	-
	সেবা থেকে প্রাপ্ত কর	০	০.০০	৫,০০০	০.৫০	-
	সম্পদ কর	০	০.০০	৩০,০০০	২.৯৯	-
	বিমান পরিবহন ও ভ্রমণ কর	০	০.০০	৫,৫০০	০.৫৫	-
৯০০	অন্যান্য কর	১,৪৮২	০.৪৩	৪,০০০	০.৪০	২.৭০
	মোট-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ:	**২৯৬,২০১**	৮৬.২৭	**৬৭১,৫৬০**	৬৬.৯৯	২.২৭
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত করসমূহ					-

(চলমান)

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯: সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট*		২০১৯-২০: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের জন্য প্রস্তাবিত আয়ের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কতগুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
১০০০	মাদক শুল্ক	১০২	০.০৩	১৬,০০০	১.৬০	১৫৬.৮৬
১১০০	যানবাহন কর	১,৪২৯	০.৪২	২৫,০০০	২.৪৯	১৭.৪৯
১২০০	ভূমি রাজস্ব	১,৪০০	০.৪১	১২,০০০	১.২০	৮.৫৭
১৩০০	স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল)	**৬,৩০৩**	১.৮৪	৭,০০০	০.৭০	১.১১
	সারচার্জ/১>	৪৯৩	০.১৪		০.০০	০.০০
	উপমোট-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত করসমূহ:	**৯,৭২৭**	**২.৮৩**	**৬০,০০০**	৫.৯৮	৬.১৭
	মোট-করসমূহ হইতে প্রাপ্তি	**৩০৫,৯২৮**	**৮৯.১১**	**৭৩১,৫৬০**	৭২.৯৭	২.৩৯
	কর ব্যতীত প্রাপ্তি		০.০০		০.০০	-
১৫০০	লভ্যাংশ ও মুনাফা	৩,৪০৪	০.৯৯	৩৫,০০০	৩.৪৯	১০.২৮
১৬০০	সুদ	৫,৪৬২	১.৫৯	৭,০০০	০.৭০	১.২৮
১৭০০	রয়্যালটি এবং সম্পদ হইতে আয়	-	০.০০	৭০০	০.০৭	-
১৮০০	প্রশাসনিক ফি	৩,৮৯৪	১.১৩	৮,০০০	০.৮০	২.০৫
১৯০০	জরিমানা, দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৬০১	০.১৮	৫০,০০০	৪.৯৯	৮৩.১৯
২০০০	সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৬,৬৫৫	১.৯৪	৮,০০০	০.৮০	১.২০
২১০০	ভাড়া ও ইজারা	৬৩২	০.১৮	৮,০০০	০.৮০	১২.৬৬
২২০০	টোল	৬৫৭	০.১৯	৭,০০০	০.৭০	১০.৬৫
২৩০০	অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	২,৩৩১	০.৬৮	৫,০০০	০.৫০	২.১৫
২৪০০	সেচ বাবদ প্রাপ্তি	-	০.০০	৫০	০.০০	-
২৫০০	প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	০	০.০০	৮,০০০	০.৮০	-
২৬০০	কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৯,৪৮০	২.৭৬	৩০,০০০	২.৯৯	৩.১৬
৩১০০	রেলপথ	০	০.০০	৮,০০০	০.৮০	-
৩২০০	ডাক বিভাগ	০	০.০০	৭০০	০.০৭	-
৩৬০০	সরকারের সম্পদ বিক্রয় (স্টেশনারীসহ)	০	০.০০	৩,০০০	০.৩০	-

(চলমান)

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯: সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট*		২০১৯-২০: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের জন্য প্রস্তাবিত আয়ের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কতগুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি (অনুদান)	৪,০৫১	১.১৮	-	০.০০	০.০০
	মূলধন রাজস্ব	২৩৬	০.০৭	-	০.০০	০.০০
	তার ও টেলিফোন বোর্ড	০	০.০০	২,০০০	০.২০	-
	টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন	০	০.০০	৫,০০০	০.৫০	-
	এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন	০	০.০০	২,০০০	০.২০	-
	ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরী কমিশন	০	০.০০	১,০০০	০.১০	-
	সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	০	০.০০	১,০০০	০.১০	-
	বিআইডাব্লিউটিএ	০	০.০০	১,০০০	০.১০	-
	পৌর হোল্ডিং কর	০	০.০০	৪,০০০	০.৪০	-
	ডিজি হেলথ : বেসরকারী হাসপাতাল অনুমতি নবায়ন ফিস্ (permission renewal fees)	০	০	২,০০০	০.২০	-
	ডিজি ড্রাগস ঔষধ প্রস্তুতকারী কোঃ লাইসেন্স এবং নবায়ন	০	০	২,০০০	০.২০	-
	বিউটি পার্লার সেবা লব্ধ কর (service charge tax)	০	০	২,৫০০	০.২৫	-
	আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউস ক্যাপাসিটি কর capacity tax	০	০	২,৫০০	০.২৫	-
	বিদেশী পরামর্শ ফি রেমিট্যান্স কর (remittance tax)	০	০	২,৫০০	০.২৫	-
	কালো টাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি	০	০	৩০,০০০	২.৯৯	-

(চলমান)

প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯: সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট*		২০১৯-২০: অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের জন্য প্রস্তাবিত আয়ের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণের কতগুণ বেশি
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ	
	অর্থপাচার রোধ থেকে প্রাপ্তি	০	০	৩৫,০০০	৩.৪৯	
	মোট-কর ব্যতীত প্রাপ্তি	**৩৭,৪০৩**	**১০.৮৯**	**২৭০,৯৫০**	২৭.০৩	৭.২৪
	সর্বমোট-রাজস্ব প্রাপ্তি	**৩৪৩,৩৩১**	**১০০.০০**	**১,০০২,৫১০**	১০০.০০	২.৯২
						-
	ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ					-
	বিদেশে বসবাসকারী দেশীয় নাগরিকদের বন্ড	০		**৬৪,৫৮০**		-
	সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব	০		**১০০,০০০**		-
	বৈদেশিক ঋণ-নীট	৫০,০১৬		**০**		-
	ঋণ গ্রহণ (দেশীয় ব্যাংক হতে)	৪২,০২৯		**২৩,০০০**		০.৫৫
	ঋণ গ্রহণ (সঞ্চয় পত্র থেকে)	২৯,১৯৭		**৫০,০০০**		১.৭১
	মোট ঘাটতি অর্থায়ন	**১২১,২৪২**		**২৩৭,৫৮০**		১.৯৬
	সর্বমোট	**৪৬৪,৫৭৩**		**১,২৪০,০৯০**	১০০.০০	২.৬৭

১> সারচার্জ এ স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইটি সারচার্জ অন্তর্ভূক্ত

* উৎস: বাৎসরিক বাজেট ২০১৮-১৯, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৫, ৩৯। পূর্ণ অঙ্কে হিসেব করা হয়েছে, দশমিকের পরের অংশ রাখা হয়নি। 'বিবরণ' কলামের বামে যে সকল উৎসে "প্রধান অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক কোড" উল্লেখ নেই সেগুলি সরকারের আয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব। অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ২০ মে ২০১৯ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

সারণি ২: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ব্যয়ের বাজেট

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন ১>					উন্নয়ন					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৮-১৯ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০১৯-২০ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১	**জনপ্রশাসন**	**৭২,৫৫৮**	**২৫.৪৭**	**১৩২,৭৯০**	**২৪.৬৫**	**১.৮৩**	**১০,৯৫১**	**৬.১০**	**৪৪,৫৫০**	**৬.৩৫**	**৪.০৭**	**৮৩,৫০৯**	**১৭৭,৩৪০**	২.১২
১.১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ১>	২৩	০.০১	৪০	০.০১	**১.৭৪**	-	০.০০	**১০০**	০.০১	-	২৩	১৪০	৬.০৯
১.২	জাতীয় সংসদ ২>	২৯৮	০.১০	৪০০	০.০৭	**১.৩৪**	৩৪	০.০২	**১০০**	০.০১	**২.৯৪**	৩৩২	৫০০	১.৫১
১.৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৪৮৭	০.১৭	৫৫০	০.১০	**১.১৩**	২,৩১৪	১.২৯	**৫,০০০**	০.৭১	**২.১৬**	২,৮০১	৫,৫৫০	১.৯৮
১.৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৭৪	০.০৩	১০০	০.০২	**১.৩৫**	৭৩	০.০৪	**২০০**	০.০৩	**২.৭৪**	১৪৭	৩০০	২.০৪
১.৫	নির্বাচন কমিশন	১,৬৮৫	০.৫৯	২,০০০	০.৩৭	**১.১৯**	২১০	০.১২	**১,২০০**	০.১৭	**৫.৭১**	১,৮৯৫	৩,২০০	১.৬৯
১.৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২,১৭৭	০.৭৬	২,৫০০	০.৪৬	**১.১৫**	২৮৭	০.১৬	**৫০০**	০.০৭	**১.৭৪**	২,৪৬৪	৩,০০০	১.২২
১.৭	সরকারি কর্ম কমিশন	৪৭	০.০২	১৫০	০.০৩	**৩.১৯**	৩০	০.০২	**২৫০**	০.০৪	**৮.৩৩**	৭৭	৪০০	৫.১৯
১.৮	অর্থ বিভাগ ৩>	৬৩,৭৯৫	২২.৩৯	১২০,০০০	২২.২৭	**১.৮৮**	৩,৪৪৬	১.৯২	২০,০০০	২.৮৫	**৫.৮০**	৬৭,২৪১	১৪০,০০০	২.০৮
১.৯	নিয়ন্ত্রণ মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন (বিএসইসি, আইডিআরএ, পুঁজি বাজার, প্রতিযোগিতা কমিশন ইত্যাদি)	-	০.০০	৪০০	০.০৭	-	-	০.০০	৫,০০০	০.৭১	-	-	৫,৪০০	-
১.১০	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২,০৩৭	০.৭১	২,৭০০	০.৫০	**১.৩৩**	৩৮৯	০.২২	২,৫০০	০.৩৬	**৬.৪৩**	২,৪২৬	৫,২০০	২.১৪
১.১১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২৭৯	০.১০	৫০০	০.০৯	**১.৭৯**	২,১৮৩	১.২২	৪,০০০	০.৫৭	**১.৮৩**	২,৪৬২	৪,৫০০	১.৮৩
১.১২	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৪৪	০.০৯	৪০০	০.০৭	**১.৬৪**	৩৫	০.০২	২০০	০.০৩	**৫.৭১**	২৭৯	৬০০	২.১৫
১.১৩	পরিকল্পনা বিভাগ ৪>	৭৩	০.০৩	৬০০	০.১১	**৮.২২**	১,৩০৬	০.৭৩	২,৫০০	০.৩৬	**১.৯১**	১,৩৭৯	৩,১০০	২.২৫
১.১৪	বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৩৭	০.০১	৩০০	০.০৬	**৮.১১**	৯৮	০.০৫	৫০০	০.০৭	**৫.১০**	১৩৫	৮০০	৫.৯৩
১.১৫	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৮২	০.০৬	৬৫০	০.১২	**৩.৫৭**	৪১৭	০.২৩	২,০০০	০.২৯	**৪.৮০**	৫৯৯	২,৬৫০	৪.৪২
১.১৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,১২০	০.৩৯	১,৫০০	০.২৮	**১.৩৪**	১২৯	০.০৭	৫০০	০.০৭	**৩.৮৮**	১,২৪৯	২,০০০	১.৬০
২	**স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন**	**৪,৫১৬**	**১.৫৯**	**১২,১০০**	**২.২৫**	**২.৬৮**	**২৮,১৫২**	**১৫.৬৭**	**৫৮,১০০**	**৮.২৮**	**২.০৬**	**৩২,৬৬৮**	**৭০,২০০**	২.১৫
২.১	কর ন্যায়পালের অফিস	-	০.০০	১০০	০.০২	-	-	০.০০	১০০	০.০১	-	-	২০০	-
২.২	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩,৬৮২	১.২৯	৭,৫০০	১.৩৯	**২.০৪**	২৫,৪৬৮	১৪.১৭	৫০,০০০	৭.১৩	**১.৯৬**	২৯,১৫০	৫৭,৫০০	১.৯৭

(চলমান)

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন ১>					উন্নয়ন					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৮-১৯ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০১৯-২০ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
২.৩	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৫১৪	০.১৮	৩,০০০	০.৫৬	**৫.৮৪**	১,৬৯৫	০.৯৪	৬,০০০	০.৮৬	**৩.৫৪**	২,২০৯	৯,০০০	৪.০৭
২.৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩২০	০.১১	১,৫০০	০.২৮	**৪.৬৯**	৯৮৯	০.৫৫	২,০০০	০.২৯	**২.০২**	১,৩০৯	৩,৫০০	২.৬৭
						-					-			-
৩	**প্রতিরক্ষা**	**২৭,৯৩২**	**৯.৮০**	**৩৩,১৫০**	**৬.২**	**১.১৯**	**১,১৫২**	**০.৬৪**	**১,৬০০**	**০.২৩**	**১.৩৯**	**২৯,০৮৪**	**৩৪,৭৫০**	১.১৯
৩.১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিস	২৬,৭৫০	**৯.৩৯**	**৩০,০০০**	৫.৫৭	**১.১২**	১,১৫২	০.৬৪	১,৫০০	০.২১	**১.৩০**	২৭,৯০২	৩১,৫০০	১.১৩
৩.২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-অন্যান্য সার্ভিস	১,১৪৭	**০.৪০**	**৩,০০০**	০.৬	**২.৬২**	-		-		-	১,১৪৭	৩,০০০	২.৬২
৩.৪	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	৩৫	**০.০১**	**১৫০**	০.০	**৪.২৯**	-	০.০০	**১০০**	০.০১	-	৩৫	২৫০	৭.১৪
৪	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা**	**২৩,৫৭৫**	**৮.২৭**	**৩৪,৭০০**	**৬.৪৪**	**১.৪৭**	**৩,০১৯**	**১.৬৮**	**১০,৪০০**	**১.৪৮**	**৩.৪৪**	**২৬,৫৯৪**	**৪৫,১০০**	১.৭০
৪.১	সুপ্রিম কোর্ট	১৮০	০.০৬	৫০০	০.০৯	**২.৭৮**	-	০.০০	৭০০	০.১০	-	১৮০	১,২০০	৬.৬৭
৪.২	আইন ও বিচার বিভাগ	১,০৪০	০.৩৭	২,০০০	০.৩৭	**১.৯২**	৪৮১	০.২৭	১,০০০	০.১৪	**২.০৮**	১,৫২১	৩,০০০	১.৯৭
৪.৩	জননিরাপত্তা বিভাগ	২০,১৪৮	৭.০৭	২৮,০০০	৫.২০	**১.৩৯**	১,২৫৮	০.৭০	৫,০০০	০.৭১	**৩.৯৭**	২১,৪০৬	৩৩,০০০	১.৫৪
৪.৪	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৩৫	০.০১	২০০	০.০৪	**৫.৭১**	-	০.০০	২০০	০.০৩	-	৩৫	৪০০	১১.৪৩
৪.৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	৮৯	০.০৩	৫০০	০.০৯	**৫.৬২**	২৯	০.০২	৫০০	০.০৭	**১৭.২৪**	১১৮	১,০০০	৮.৪৭
৪.৬	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২,০৮৩	০.৭৩	৩,৫০০	০.৬৫	**১.৬৮**	১,২৫১	০.৭০	৩,০০০	০.৪৩	**২.৪০**	৩,৩৩৪	৬,৫০০	১.৯৫
৫	**শিক্ষা ও প্রযুক্তি**	**৩৮,৬১৫**	**১৩.৫৫**	**১০৯,৫০০**	**২০.৫১**	**২.৮৪**	**২৯,৩২০**	**১৫.৮৭**	**১৭৫,০০০**	**২৫.০৯**	**৫.৯৭**	**৬৭,৯৩৫**	**২৮৪,৫০০**	৪.১৯
৫.১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪,১৫৪	৪.৯৭	৪৫,০০০	৮.৩৫	**৩.১৮**	৮,৩১২	৪.৬৩	**৪০,০০০**	৫.৭০	**৪.৮১**	২২,৪৬৬	৮৫,০০০	৩.৭৮
৫.২	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	১৮,৮৭৪	৬.৬২	৫০,০০০	৯.২৮	**২.৬৫**	৬,০১৪	৩.৩৫	**৩৫,০০০**	৪.৯৯	**৫.৮২**	২৪,৮৮৮	৮৫,০০০	৩.৪২
৫.৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৪৮০	০.১৭	২,০০০	০.৩৭	**৪.১৭**	১১,৭২০	৬.৫২	**৪০,০০০**	৫.৭০	**৩.৪১**	১২,২০০	৪২,০০০	৩.৪৪
৫.৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২১৩	০.০৭	২,৫০০	০.৪৬	**১১.৭৪**	২,৪৬৮	১.৩৭	**৫০,০০০**	৭.১৩	**২০.২৬**	২,৬৮১	৫২,৫০০	১৯.৫৮
৫.৪	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৪,৮৯৪	১.৭২	১০,০০০	১.৮৬	**২.০৪**	৮০৬	০.৪৫	**১০,০০০**	১.৪৩	**১২.৪১**	৫,৭০০	২০,০০০	৩.৫১
	মাদ্রাসা (কারিগরি ও মাদ্রাসা পৃথক করা হয়েছে)	-	-	১,০০০	০.১৯	-	-	-	**১,০০০**	০.১৪	-	-	২,০০০	-
৬	**স্বাস্থ্য**	**১২,২৪২**	**৪.৩০**	**৩৯,৪০০**	**৭.৩১**	**৩.২২**	**১১,১৪১**	**৬.২০**	**৫৫,০০০**	**৭.৮৪**	**৪.৯৪**	**২৩,৩৮৩**	**৯৪,৪০০**	৪.০৪
৬.১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৯,১১৮	৩.২০	৩৪,৪০০	৬.৩৯	**৩.৭৭**	৯,০৪১	৫.০৩	**৫০,০০০**	৭.১৩	**৫.৫৩**	১৮,১৫৯	৮৪,৪০০	৪.৬৫
৬.২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৩,১২৪	১.১০	৫,০০০	০.৯৩	**১.৬০**	২,১০০	১.১৭	**৫,০০০**	০.৭১	**২.৩৮**	৫,২২৪	১০,০০০	১.৯১

(চলমান)

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন ১>					উন্নয়ন					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৮-১৯ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০১৯-২০ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
৭	**সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ**	**২১,৫৮৩**	**৭.৫৮**	**৪৪,৭৫০**	**৮.৩১**	**২.০৭**	**৫,৫৭৩**	**৩.১০**	**৩৫,৫০০**	**৫.০৬**	**৬.৩৭**	**২৭,১৫৬**	**৮০,২৫০**	২.৯৬
৭.১	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫,৩৩৯	১.৮৭	৮,৫০০	১.৫৮	**১.৫৯**	২৫৪	০.১৪	২,০০০	০.২৯	**৭.৮৭**	৫,৫৯৩	১০,৫০০	১.৮৮
৭.২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,৯৮০	১.০৫	৮,৭৫০	১.৬২	**২.৯৪**	৫০৯	০.২৮	২,০০০	০.২৯	**৩.৯৩**	৩,৪৮৯	১০,৭৫০	৩.০৮
৭.৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩,৩৯১	১.১৯	৫,৫০০	১.০২	**১.৬২**	৭৬৪	০.৪৩	২,৫০০	০.৩৬	**৩.২৭**	৪,১৫৫	৮,০০০	১.৯৩
৭.৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬,১৬২	২.১৬	৮,০০০	১.৪৮	**১.৩০**	৩,৪৯৬	১.৯৫	১৪,০০০	২.০০	**৪.০০**	৯,৬৫৮	২২,০০০	২.২৮
৭.৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৭১১	১.৩০	১৪,০০০	২.৬০	**৩.৭৭**	৫৫০	০.৩১	১৫,০০০	২.১৪	**২৭.২৭**	৪,২৬১	২৯,০০০	৬.৮১
৮	**গৃহায়ন**	**১,৪৪৩**	**০.৫১**	**৫,০০০**	**০.৯৩**	**৩.৪৭**	**৩,৫২০**	**১.৯৬**	**১৬,০০০**	**২.২৮**	**৪.৫৫**	**৪,৯৬৩**	**২১,০০০**	**৪.২৩**
৮.১	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১,৪৪৩	০.৫১	৫,০০০	০.৯৩	**৩.৪৭**	৩,৫২০	১.৯৬	১৬,০০০	২.২৮	**৪.৫৫**	৪,৯৬৩	২১,০০০	৪.২৩
৯	**বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম**	**২,৩৭৩**	**০.৮৩**	**৫,১৫০**	**০.৯৬**	**২.১৭**	**১,৯৬৮**	**১.১০**	**৫,৭০০**	**০.৮১**	**২.৯০**	**৪,৩৪১**	**১০,৮৫০**	২.৫০
৯.১	তথ্য মন্ত্রণালয়	৬৪৩	০.২৩	১,২০০	০.২২	**১.৮৭**	৫২২	০.২৯	১,২০০	০.১৭	**২.৩০**	১,১৬৫	২,৪০০	২.০৬
৯.২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৯০	০.১০	১,৫০০	০.২৮	**৫.১৭**	২২০	০.১২	২,০০০	০.২৯	**৯.০৯**	৫১০	৩,৫০০	৬.৮৬
৯.৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৪৭	০.০৯	২৫০	০.০৫	**১.০১**	৯২১	০.৫১	১,০০০	০.১৪	**১.০৯**	১,১৬৮	১,২৫০	১.০৭
৯.৪	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**১,১৯৩**	০.৪২	২,২০০	০.৪১	**১.৮৪**	৩০৫	০.১৭	১,৫০০	০.২১	**৪.৯২**	১,৪৯৮	৩,৭০০	২.৪৭
১০	**বিদ্যুৎ ও জ্বালানী**	**২০৮**	**০.০৭**	**৬০০**	**০.১১**	**২.৮৮**	**২৪,৭১৩**	**১৩.৭৫**	**১৪০,০০০**	**৩৭.০৭**	**৫.৬৭**	**২৪,৯২১**	**১৪০,৬০০**	৫.৬৪
১০.১	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৬৫	০.০৬	৩৫০	০.০৬	**২.১২**	১,৮২০	১.০১	২০,০০০	২.৮৫	**১০.৯৯**	১,৯৮৫	২০,৩৫০	১০.২৫
১০.২	বিদ্যুত বিভাগ	৪৩	০.০২	২৫০	০.০৫	**৫.৮১**	২২,৮৯৩	১২.৭৪	১২০,০০০	১৭.১১	**৫.২৪**	২২,৯৩৬	১২০,২৫০	৫.২৪
	বিদ্যুত উৎপাদন		০.০০	-	০.০০	-	-	০.০০	২০,০০০	২.৮৫	-	-	২০,০০০	-
	বিদ্যুত সঞ্চলন		০.০০	-	০.০০	-	-	০.০০	৪০,০০০	৫.৭০	-	-	৪০,০০০	-
	বিদ্যুত বিতরণ		০.০০	-	০.০০	-	-	০.০০	৬০,০০০	৮.৫৫	-	-	৬০,০০০	-
১১	**কৃষি ৫>**	**১৬,৩১২**	৫.৭৩	**২৯,৫০০**	৫.৪৮	**১.৮১**	**৯,৯৪৮**	৫.৫৪	**২০,০০০**	**২.৮৫**	**২.০১**	**২৬,২৬০**	**৪৯,৫০০**	১.৮৮
১১.১	কৃষি মন্ত্রণালয়	১১,৯৫১	৪.১৯	২০,০০০	৩.৭১	**১.৬৭**	১,৯৫৯	১.০৯	৪,০০০	০.৫৭	**২.০৪**	১৩,৯১০	২৪,০০০	১.৭৩
১১.২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৮৪	০.৩৫	২,০০০	০.৩৭	**২.০৩**	৮৮৪	০.৪৯	২,৫০০	০.৩৬	**২.৮৩**	১,৮৬৮	৪,৫০০	২.৪১
১১.৩	পরিবেশ, বন মন্ত্রণালয়	৭৮৯	০.২৮	২,০০০	০.৩৭	**২.৫৩**	৪৮১	০.২৭	২,৫০০	০.৩৬	**৫.২০**	১,২৭০	৪,৫০০	৩.৫৪

(চলমান)

কোড	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, খাত	পরিচালন ১>					উন্নয়ন					পরিচালন+উন্নয়ন = মোট বরাদ্দ		
		২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে	২০১৮-১৯*		২০১৯-২০		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি	২০১৮-১৯ (সরকার প্রস্তাবিত)	২০১৯-২০ (অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব)	অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাবে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে
		সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব			সরকার প্রস্তাবিত		অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব					
		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ		কোটি টাকায়	শতাংশ	কোটি টাকায়	শতাংশ				
১১.৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১,১০১	০.৩৯	৩,০০০	০.৫৬	**২.৭২**	১,০১৮	০.৫৭	৩,০০০	০.৪৩	**২.৯৫**	২,১১৯	৬,০০০	২.৮৩
১১.৫	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৪৮৭	০.৫২	২,৫০০	০.৪৬	**১.৬৮**	৫,৬০৬	৩.১২	৮,০০০	১.১৪	**১.৪৩**	৭,০৯৩	১০,৫০০	১.৪৮
১২	**শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস**	**১,০৮৫**	**০.৩৮**	**৩,৩৫০**	**০.৬২**	**৩.০৯**	**২,৩৮১**	**১.৩৩**	**১০,৫০০**	**১.৫০**	**৪.৪১**	**৩,৪৬৬**	**১৩,৮৫০**	৪.০০
১২.১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২০৯	০.০৭	৭৫০	০.১৪	**৩.৫৯**	৩৪৭	০.১৯	**২,৫০০**	০.৩৬	**৭.২০**	৫৫৬	৩,২৫০	৫.৮৫
১২.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১১১	০.০৪	৭৫০	০.১৪	**৬.৭৬**	১১৬	০.০৬	১,০০০	০.১৪	**৮.৬২**	২২৭	১,৭৫০	৭.৭১
১২.৩	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৯৩	০.১০	৬০০	০.১১	**২.০৫**	১,০৫৯	০.৫৯	৩,৫০০	০.৫০	**৩.৩১**	১,৩৫২	৪,১০০	৩.০৩
১২.৪	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৮৭	০.১০	৭৫০	০.১৪	**২.৬১**	৩০৭	০.১৭	১,৫০০	০.২১	**৪.৮৯**	৫৯৪	২,২৫০	৩.৭৯
১২.৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৮৫	০.০৬	৫০০	০.০৯	**২.৭০**	৫৫২	০.৩১	২,০০০	০.২৯	**৩.৬২**	৭৩৭	২,৫০০	৩.৩৯
১৩	**পরিবহন ও যোগাযোগ**	**৮,৬৩৩**	**৩.০৩**	**১৯,৭৫০**	**৩.৬৭**	**২.২৯**	**৪৭,৮৩১**	**২৬.৬২**	**১২৯,০০০**	**১৮.৩৯**	**২.৭০**	**৫৬,৪৬৪**	**১৪৮,৭৫০**	২.৬৩
১৩.১	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩,৫৬৩	১.২৫	৭,০০০	১.৩০	**১.৯৬**	২০,৮১৭	১১.৫৯	৪০,০০০	৫.৭০	**১.৯২**	২৪,৩৮০	৪৭,০০০	১.৯৩
১৩.২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৩,৩৮৭	১.১৯	৫,০০০	০.৯৩	**১.৪৮**	১১,১৫৫	৬.২১	৩২,০০০	৪.৫৬	**২.৮৭**	১৪,৫৪২	৩৭,০০০	২.৫৪
১৩.৩	নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৬৩২	০.২২	১,২০০	০.২২	**১.৯০**	২,৯০৫	১.৬২	২০,০০০	২.৮৫	**৬.৮৮**	৩,৫৩৭	২১,২০০	৫.৯৯
১৩.৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৪৭	০.০২	৪,৫০০	০.৮৪	**৯৫.৭৪**	১,৪৬১	০.৮১	৫,০০০	০.৭১	**৩.৪২**	১,৫০৮	৯,৫০০	৬.৩০
১৩.৫	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১,০০২	০.৩৫	২,০০০	০.৩৭	**২.০০**	২,৩৮১	১.৩৩	১০,০০০	১.৪৩	**৪.২০**	৩,৩৮৩	১২,০০০	৩.৫৫
১৩.৬	সেতু বিভাগ	২	০.০০	৫০	০.০১	**২৫.০০**	৯,১১২	৫.০৭	২২,০০০	৩.১৪	**২.৪১**	৯,১১৪	২২,০৫০	২.৪২
১৪	**সুদ**	**৫১,৩৪০**	**১৮.০২**	**৬২,০০০**	**১১.৫১**	**১.২১**	-	-	-	-	-	**৫১,৩৪০**	**৬২,০০০**	১.২১
১৪.১	অভ্যন্তরীণ	৪৮,৩৭৭	১৬.৯৮	৫৫,০০০	১০.২১	**১.১৪**	-	-	-	-	-	৪৮,৩৭৭	৫৫,০০০	১.১৪
১৪.২	বৈদেশিক	২,৯৬৩	১.০৪	৭,০০০	১.৩০	**২.৩৬**	-	-	-	-	-	২,৯৬৩	৭,০০০	২.৩৬
১৫	**বিবিধ ব্যয়**	**২,৪৮৯**	**০.৮৭**	**৭,০০০**	**১.৩০**	**২.৮১**	-	-	-	-	-	**২,৪৮৯**	**৭,০০০**	২.৮১
১৫.১	খাদ্য হিসাব	৩৬৫	০.১৩	৪,০০০	০.৭৪	**১০.৯৬**	-	-	-	-	-	৩৬৫	৪,০০০	১০.৯৬
১৫.২	ঋণ ও অগ্রিম	২,১২৪	০.৭৫	৩,০০০	০.৫৬	**১.৪১**	-	-	-	-	-	২,১২৪	৩,০০০	১.৪১
	মোট	**২৮৪,৯০৪**	১০০	**৫৩৮,৭৪০**	১০০	১.৮৯	১৭৯,৬৬৯	১০০	**৭০১,৩৫০**	১০০	৩.৯০	**৪৬৪,৫৭৩**	১,২৪০,০৯০	২.৬৭

১> পূর্বের 'অনুনয়ন ব্যয়'-কে নতুন প্রবর্তিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে 'পরিচালন ব্যয়' হিসেবে দেখানো হয়েছে।

২> উন্নয়ন কার্যক্রম=এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও স্থানান্তর + এডিপি বহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প+স্কিম (পূর্বের রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী)+বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি।

৩> পরিচালন ব্যয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যয়, ভর্তুকি ও প্রণোদনা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ ফান্ড এবং রপ্তানি সহায়তা বাবদ ৭,৫০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

৪> পরিকল্পনা বিভাগের প্রাক্কলিত উন্নয়ন ব্যয়ে বিশেষ প্রয়োজনে প্রদেয় উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ১,১২৬.৯১ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৫> কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয়ে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম খাতে প্রণোদনা বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ৬,০০০ কোটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

(*) উৎস: বাৎসরিক বাজেট ২০১৮-১৯, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৬-১৪। অর্থনীতি সমিতির প্রস্তাব সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ২০ মে ২০১৯ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

আমাদের বাজেট প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের মোট রাজস্ব আয় হবে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সরকার প্রদত্ত বাজেটের তুলনায় ২.৯২ গুণ বেশী। সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিকল্প বাজেটে এ বৃদ্ধি হবে প্রধানত তিনটি কারণে : (১) আয়ের বিভিন্ন উৎসে যৌক্তিক বৃদ্ধি যেমন, আয় ও মুনাফার উপরে কর, আমদানি শুল্ক, মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, লভ্যাংশ ও মুনাফা, জরিমানা-দন্ড-বাজেয়াপ্তকরণ, টোল, ভাড়া ও ইজারা, সরকারের সম্পদ বিক্রয়। বিভিন্ন উৎসে এ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ থেকে ১৫৬ গুণ পর্যন্ত (যেমন মাদক শুল্ক; সারণি ১ দেখুন); (২) কোন কোন উৎসের ক্ষেত্রে কর হার পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র কর আদায় প্রক্রিয়া জোরদার করে যেমন, মূল্য সংযোজন কর; (৩) প্রস্তাবিত নতুন উৎসসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি যেমন ২০-টি নতুন উৎস যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হ'ল অর্থপাচার রোধ থেকে প্রাপ্তি, কালো টাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি এবং সম্পদ কর (এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন সারণি ১)।

এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, আমাদের প্রস্তাবনায় আমরা সরকারের মোট রাজস্ব প্রাপ্তির যে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকার হিসেব দিয়েছি 'আদর্শ' পরিমাণটা হতে পারে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। কারণ, কর ও কর বহির্ভূত অনেক উৎস আছে যে সবে রাজস্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সাধারণভাবে যা মনে করা হয় প্রকৃত সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি। যেমন আয় ও মুনাফার উপর কর। আয় কর ফাঁকি নিত্যনৈমিত্তিক

ব্যাপার; উচ্চ আয়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আসলে নির্ধারিত আয়কর দেন না; দেশে বড়জোর ১০০-১৫০ জন ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা অথবা তার বেশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে (কর্পোরেট নয়) কর দেন যেখানে এ সংখ্যাটি হবার কথা কমপক্ষে ৫০ হাজার জন ব্যক্তি; "রেন্ট-সিকার"রা বিপুল পরিমাণে কর ফাঁকি দিতে হেন পথ-পদ্ধতি নেই যা অবলম্বন করেন না। আবার কালো টাকার মালিকরা তো তাদের কালো টাকার উপর কোন করই দেন না, কারণ কালো টাকার উপর কি ভাবে কর দেবেন? কালো টাকা যদি বৈধ আয়ই না হয়ে থাকে তাহলে আয়ের উপর কর অর্থাৎ আয়কর কি ভাবে দেবেন, কোথায় দেবেন? আবার কালো টাকা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করলে তো সহজেই সরকারের রাজস্ব আয়ের "কর ব্যতীত প্রাপ্তি" খাত থেকে রাজস্ব আহরণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। আবার জমি সম্পত্তি অথবা ফ্ল্যাট কিনে যে দামে রেজিস্ট্রি করা হয় এবং তা কিনতে আসলে যে মূল্য পরিশোধ করা হয় সে ফারাক উদ্ভূত রাজস্ব কোথায়? এ থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই কালো টাকার ফাঁদে পড়েন। এসবই 'ওপেন সিক্রেট'। এসবই হলো শর্ষের মধ্যে ভূত। এসব ভূত নিয়ে ভাবনা জরুরি। কারণ "দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স" সরকারের অন্যতম নিবার্চনী প্রতিশ্রুতি।

আমাদের ২০১৯-২০-এর বিকল্প বাজেটে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট মিলে আমরা মোট ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০ কোটি টাকার ব্যয় প্রস্তাব করেছি যা গত বছরের বাজেটের তুলনায় ২.৬৭ গুণ বেশি (গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের বাজেট আকার ছিল মোট ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা)। আমাদের প্রস্তাবনায় বাজেটের আকারই শুধু তুলনামুলক বড় নয় সেই সাথে কাঠামোগত বড় পরিবর্তন যেক্ষেত্রে ঘটছে তা হল মোট বাজেটে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট বরাদ্দের অনুপাত। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের বাজেটে যেখানে উন্নয়ন: পরিচালন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত ছিল ৩৯:৬১ সেখানে আমাদের প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ বাজেটে উন্নয়ন: পরিচালন বাজেট বরাদ্দ অনুপাত হবে ৫৭:৪৩। অর্থাৎ সহজ কথায়, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ কাঠামো প্রচলিত বাজেটের তুলনায় অনেক বেশি উন্নয়নমুখী। কারণ গত বাজেটে যেখানে মোট ১০০ টাকার বরাদ্দে উন্নয়ন ব্যয় হত ৩৯ টাকা সেখানে আমাদের প্রস্তাবনানুযায়ী সেটা হবে ৫৭ টাকা। আবার যেহেতু গত বাজেটের তুলনায় আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন বাজেট ৩.৯ গুণ বেশি সেহেতু উন্নয়নে মোট বরাদ্দও আনুপাতিক হারে ততগুণই বাড়বে। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হবে এক কথায় উন্নয়ন-অভিমুখী। আর একই সাথে উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকারী এবং বৈষম্যহ্রাসকারী।

আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটকে শুধু উন্নয়নমুখী বলাই যথেষ্ট নয়। খাতওয়ারি বরাদ্দ কাঠামো যা তাতে বলতেই হবে যে প্রস্তাবিত বরাদ্দ কাঠামো দারিদ্র্য-বৈষম্য নিরসনমুখী, উৎপাদনমুখী, উপাদনশীলতা বৃদ্ধিমুখী, শিল্পায়নমুখী, কৃষির বিকাশমুখী, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমুখী ও মানব সম্পদ ও মানবপুঁজি সৃষ্টি ও তার বিকাশ ত্বরান্বয়নমুখী এবং প্রযুক্তি-বিকাশমুখী। এসব উপসংহারে উপনীত হবার কারণ অনেক, যার মধ্যে অন্যতম হল: (১)

২০১৮-১৯ অর্থবছরের (সরকার প্রস্তাবিত) তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে যেখানে মোট বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে ২.৬৭ গুণ বেশি সেখানে একই সময়ে উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ৩.৯ গুণ বেশী আর পরিচালন বাজেট ১.৮৯ গুণ বেশি, (২) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে খাতওয়ারি প্রস্তাবিত বরাদ্দও অধিকতর প্রগতিমুখী। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আমরা অগ্রাধিকারক্রম ভিত্তিতে খাতওয়ারি সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রস্তাব করছি: (১) 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি'তে মোট ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (যার ৫৯.৮% ব্যয় হবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায়); (২) 'জনপ্রশাসন', যেখানে মোট অনুমিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা (যে ব্যয়ের ৭৮.৯% হলো অর্থবিভাগ সংশ্লিষ্ট); তার পরে আছে যথাক্রমে: (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯ এর তুলনায় ২.৬৩ গুণ বেশি), (৪) "বিদ্যুৎ ও জ্বালানী" যেখানে মোট প্রস্তাবিত ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় প্রায় ৫.৬৪ গুণ বেশি); (৫) স্বাস্থ্য খাতে ৯৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় ৪ গুণ বেশি), (৬) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ৮০ হাজার ২৫০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় ২.৯৬ গুণ বেশি)। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ অন্যান্য খাতেও চলতি বছরের সরকারি বরাদ্দের চেয়ে বেশি। যেমন, কৃষি খাতে ৪৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় ১.৮৮ গুণ বেশি), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৭০ হাজার ২০০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় ২.১৫ গুণ বেশি), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস খাতে ১৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় ৪ গুণ বেশি), জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা খাতে ৪৫ হাজার ১১৫ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর তুলনায় ১.৭ গুণ বেশি), প্রতিরক্ষা খাতে ৩৪ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা (যা ২০১৮-১৯-এর বাজেটের তুলনায় ১.১৯ গুণ বেশি)।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট ব্যয়-বরাদ্দে "প্রতিরক্ষা", "জনপ্রশাসন", 'অভ্যন্তরীণ সুদ' ও "ঋণ ও অগ্রিম"–এসব খাতের বরাদ্দ-গতি অন্যান্য খাতের চেয়ে কম; আর বেশ কিছু নতুন ব্যয় খাত-উপখাত প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম "কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার" (৩ হাজার কোটি টাকা), "শিল্পায়ন ত্বরান্বয়ন" (৫ হাজার কোটি টাকা), "আদারওয়াইজ এ্যাবল" বা "প্রতিবন্ধী মানুষ" (২ হাজার কোটি টাকা), "হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন" (২ হাজার কোটি টাকা), দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি সুদ বিহীন ঋণ (৩ হাজার কোটি টাকা), "কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায বাজার মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ" (৭ হাজার কোটি টাকা), "নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধ" (২ হাজার কোটি টাকা), "নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন-উদ্দিষ্ট ক্ষুদ্র-অনুদান ও প্রশিক্ষণ" (৪ হাজার কোটি টাকা), "জেনোমিক মেডিসিন" (১ হাজার কোটি টাকা), "নবজাতক শিশুর থাইরয়ড স্ক্রীনিং" (১ হাজার কোটি টাকা), "স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোর নিম্ন ও মধ্য স্তরে ব্যয়-বহুল অসংক্রামক (নন-কমিউনিকেবল) রোগের চিকিৎসা" যেমন ক্যানসার, হার্ট, কিডনি,

ডায়াবেটিস ইত্যাদি (৫ হাজার কোটি টাকা), "জাতীয় অনুবাদ প্রতিষ্ঠান, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, পাঠাগার" (১ হাজার কোটি টাকা) ইত্যাদি।

আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯০ কোটি টাকা আর রাজস্ব প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা। কেউ হয়তো বলবেন ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা ঘাটতি অনেক বড় ঘাটতি। এই বিষয়ে অনর্থক কোন তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে (জাপানে বাজেট ঘাটতি ২৫৬%) আমরা বলতে চাই যে যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে ঘাটতি বাজেটে অসুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে বাজেটে ১ পয়সাও ঘাটতি না রেখে আমাদের প্রস্তাবিত রাজস্ব আয় অর্থাৎ ১০ লক্ষ ২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা দিয়েও মোট বাজেট প্রস্তুত করতে পারেন। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উন্নয়ন ইতিহাস থেকে একটা কথা বলে রাখা জরুরি যে আজকের উন্নত/ধনী দেশের প্রায় সকলেই যখন উন্নতি করছিলো—১৯৩০ থেকে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত সময়কালে—তখন তাদের সকলেরই সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ছিলো বেশ বেশি, তখন তাদের প্রবৃদ্ধির হারও ছিলো বেশি, তখন গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) খাতে সরকারি বরাদ্দ ছিলো অত্যুচ্চ, এবং তাদের সকলেরই বাজেট ঘাটতিও ছিলো বেশি, আর উচ্চ মাত্রার সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ব্যক্তিগত খাতের বিকাশে বাধাও ছিল না।

সারণি ৩: একনজরে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাব, ২০১৯-২০ (এবং তার সাথে সরকারের চলতি অর্থবছর ২০১৮-১৯-এর তুলনা)

বিবরণ	সরকারের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট
মোট-বাজেট (কোটি টাকায়) পরিচালন ব্যয় (কোটি টাকায়) উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)	৪৬৪,৫৭৩ ২৮৪,৯০৪ ১৭৯,৬৬৯	১,২৪০,০৯০ ৫৩৮,৭৪০ ৭০১,৩৫০
উন্নয়ন- পরিচালন ব্যয় বাজেট অনুপাত	৩৯:৬১	৫৭:৪৩
মোট-রাজস্ব আয় (প্রাপ্তি) (কোটি টাকায়) মোট-রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর (কোটি টাকায়) মোট-রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর (কর ব্যতীত প্রাপ্তিসহ) (কোটি টাকায়)	৩৪৩,৩৩১ ২৯৬,২০১ ৪৭,১৩০	১,০০২,৫১০ ৬৭১,৫৬০ ৩৩০,৯৫০
রাজস্ব আয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর অনুপাত (শতাংশ)	৪৮:৫২	৬৯:৩১
রাজস্ব আয়ের প্রধান খাত সমূহ (মোট অর্থের নিরিখে)	মূল্য সংযোজন কর, আয় ও মুনাফার উপর কর, সম্পূরক কর, আমদানি শুল্ক (*যে সব খাতে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা বা বেশী*)	আয় ও মুনাফার উপর কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, জরিমানা-দন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, সম্পুরক শুল্ক, লভ্যাংশ ও মুনাফা, অর্থপাচার রোধ থেকে প্রাপ্তি, কালো টাকা উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি, সম্পদ কর, যানবাহন কর, মাদক শুল্ক, ভূমি রাজস্ব (*যে সব খাতে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা বা বেশী*)
বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার খাতসমূহ (মোট বরাদ্দের পরিমাণের নিরিখে)	জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও প্রযুক্তি, পরিবহন ও যোগাযোগ, সুদ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা, কৃষি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, স্বাস্থ্য, গৃহায়ণ, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	শিক্ষা ও প্রযুক্তি, জন প্রশাসন, পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, সুদ, কৃষি, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, গৃহায়ণ, শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
রাজস্ব আয়ে নতুন খাত/উৎসের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়	২০টি
বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা	আছে	নেই
অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা	সীমিত	উল্লেখযোগ্য (সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)
আর্থ-সামাজিক বৈষম্য-অসমতা নিরসন দর্শন	প্রান্তিকভাবে উপস্থিত	মূল লক্ষ্য

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০" একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দলিল। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, উন্নয়ন–প্রগতি দর্শনের ভিত্তিতে প্রণিত মৌলিক রূপান্তরমূখী এ দলিল বাস্তবায়নে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দৃঢ় অঙ্গীকার। অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুসহ এ দলিল আপাতত: গৃহীত হবে কি হবে না, বাস্তবায়িত হবে কি হবে না–এ সব প্রসঙ্গ ভবিষ্যতের। আমাদের লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে পথনির্দেশ করা।

অনুচ্ছেদ ৯

আমাদের উপসংহার

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে ভৌগলিক স্থানান্তর ঘটছে যার ভিত্তিতে আছে বড় আকারের মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ-এর প্রাপ্যতা। সামনের ১৫-২০ বছরে আমরাও পারি বিশ্ব অর্থনীতিতে উচ্চ আসনে আসীন হতে। বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে আমাদের এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্ভাসিত গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব এবং সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যে নেতৃত্ব এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক প্রগতি সুনিশ্চিতকরণে মানুষে-মানুষে বৈষম্য-অসমতা হ্রাসের লক্ষ্যে "সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা"–কে সর্ব্বোচ অগ্রধিকার ভিত্তিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবে। আর এ সব সম্পদের মধ্যে আছে: (১) মানব সম্পদ– যেখানে জন-সংখ্যাকে জন-সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ বিনিয়োগ করতে হবে শিক্ষায়, জনস্বাস্থ্যে, দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট খাত-ক্ষেত্রে, (২) ভৌত সম্পদ–সব ধরণের ভৌত অবকাঠামো, যেমন বিদ্যুৎ-জ্বালানী, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কার্লভাট ইত্যাদি, এবং (৩) প্রাকৃতিক সম্পদ–জমি-জলা-জঙ্গলসহ গ্যাস-তেল-কয়লা-বঙ্গোপসাগর-আকাশ-মহাকাশ। এ সব সম্পদের সমন্বিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ফলপ্রদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়োগিক ভাবনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং সে অনুযায়ী স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা ফলপ্রদতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যত উন্নয়ন-বিকাশ-প্রগতি নিশ্চিতকরণে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত এ দর্শন চিন্তার বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে এ দর্শন চিন্তাটি আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

আমরা এখন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর দোরগোড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক,

প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ-এর স্বপ্ন দেখছি। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ। এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন দলিল হতে হবে "দেশের মাটি থেকে উত্থিত বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শন ভিত্তিক" দলিল। "বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৮-১৯" শীর্ষক দলিলটি এধরণের একটি কাঠামো। ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবনা-দর্শন আত্মস্থ করে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ—বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা"—যারা বিনির্মাণ করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারি ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যাই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে, বিনির্মিত হতেই হবে সে কাঠামো যেখানে "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক"। অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে **প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, তরুণ প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসী ও আলোকিতকরণের, নারীর বহুমুখী ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের।**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত এ দর্শনটি বাস্তবায়নে নিঃসন্দেহে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে– তা হলো রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্তদের হাত থেকে সরকার ও রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে; সে অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যখন রেন্ট-সিকাররাই সরকার ও রাজনীতির অধীনস্থ সত্ত্বায় রূপান্তরিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনে সিক্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উল্লিখিত বিশ্বাসসমূহ অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, মানবিক যে কোনো মানদন্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল চেতনা-ভিত্তি। যে ভিত্তিটি গড়ে দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমাদের কাজ হবে সবায় মিলে সম্মিলিত উদ্যোগে ঐ ভিত্তিটি শক্তিশালী করে "সোনার বাংলা" সৌধটি নির্মাণ করা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
কার্যনির্বাহক কমিটি ২০১৮-২০১৯

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি	:	এ জেড এম সালেহ্ অধ্যাপক হান্নানা বেগম অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল হোসাইন এ, এফ, এম, শরিফুল ইসলাম মোঃ আবদুল হান্নান
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ
কোষাধ্যক্ষ	:	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার
যুগ্ম-সম্পাদক	:	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল বদরুল মুনির
সহ-সম্পাদক	:	মোঃ মোজাম্মেল হক শাহানারা বেগম মেহেরুননেছা নওশাদ মোস্তাফা শেখ আলী আহমেদ টুটুল
সদস্য	:	অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মামুন অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া এস এম রাশিদুল ইসলাম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সৈয়দ এসরারুল হক নেছার আহমেদ মোঃ হাবিবুল ইসলাম মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত পার্থ সারথী ঘোষ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬, মোবাইল: ০১৭১৬-৪১৮৫০০
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৯-২০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬, মোবাইল: ০১৭১৬-৪১৮৫০০
E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bea-bd.org